পঞ্চম অধ্যায়

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মূল্যায়ন

পঞ্চদশ শতক থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত দেবীকে বাংলার মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে একটি বিশেষ রূপে বাংলা সাহিত্যে দেখতে পাওয়া যায়। এই মঙ্গলকাব্যগুলি বাংলাদেশেরই একটি বিশেষ সম্পদ; কারণ, আমাদের মধ্যযুগের অন্যান্য যেসব জাতীয় সাহিত্য রয়েছে তা অল্পবিস্তর ভারতবর্ষের বিভিন্নাঞ্চলের মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু মঙ্গলকাব্য পাওয়া যায় একমাত্র বাংলা সাহিত্যেই। আনুমানিক পঞ্চদশ শতকে প্রথম মনসা নামে এক দেবীকে কেন্দ্র করে মনসামঙ্গল কাব্যের সূচনা হয়। এই মনসামঙ্গল কাব্য মঙ্গলকাব্যের ধারায় আদি সৃষ্টি। মনসামঙ্গলের পর একজন শক্তিদেবী বা লৌকিক দেবীকে কেন্দ্র করে অপর একটি মঙ্গলকাব্যের ধারার সূচনা হল। সেই শক্তিরূপিনী দেবী চণ্ডী এবং তাকে নিয়ে রচিত কাব্যের নাম চণ্ডীমঙ্গল। এই ধারার প্রথম কবি মনে করা হয় মানিক দত্তকে। তিনি চণ্ডীমঙ্গল কাব্য নামে নতুন একটি মঙ্গলকাব্য ধারার সৃষ্টি করেছিলেন, তা বললে অত্যুক্তি হবে না। মানিক দত্তের সম্বন্ধে একথা মনে রাখা সর্বত্রই প্রয়োজন যে তিনি অল্প শিক্ষিত, এমনকি অন্যান্যদের মত রাজসভার কবি নন। তিনি একজন গায়েন কবি। তাঁর সামনে ছিল সাধারণ অল্প শিক্ষিত, লোক বিশ্বাসে আশ্রিত মাটির সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত মানুষ। তাদের মানস প্রবণতা অনুযায়ী তিনি এই কাব্যটি লিখেছেন। উপরন্তু তাঁর সামনে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কোন স্ট্রাকচার ছিল না। কিন্তু তাঁর পূর্বে মনসাদেবীকে নিয়ে মনসামঙ্গল কাব্যের গঠনরীতি তৈরী হয়েছিল। তিনি মনসামঙ্গলের গঠন রীতিকে সামনে রেখে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের মঙ্গলকাব্যের ধারার সৃষ্টি করেছেন। এটাই তাঁর মূল্যায়নের মূল কথা। তিনি যে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের গঠন রীতির খসড়া তৈরী করেছিলেন সেখানেই তাঁর কৃতিত্ব। তাই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রথম কাঠামো গঠনে তাঁর স্বতন্ত্রতা নয়, বরং তাঁর কৃতিত্বের দিকটাই বড় হয়ে উঠেছে।

মানিক দত্ত উত্তরবঙ্গের কবি। উত্তরবঙ্গের মাটিতে তিনি প্রথম এই নব চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ধারা উপ্ত করলেন। তাঁর আগে এই অঞ্চলের কবি কর্তৃক মনসামঙ্গল কাব্য লিখিত হয়েছিল। তাঁদের মনসামঙ্গল কাব্য রচনার একটি আলাদা বৈচিত্র্য রয়েছে। সেটা হল সৃষ্টিতত্ত্ব দ্বারা কাব্যের সূচনা। কিন্তু যদি মনসামঙ্গল কাব্যের পূর্ববঙ্গীয় ধারায় দেখি, তাহলে দেখা যাবে সেখানে বন্দনা দ্বারা কাব্যের সূচনা হয়েছে। এমনকি পূর্ববঙ্গের মনসামঙ্গল কাব্যের কবি নারায়ণ দেব ও বিজয়গুপ্ত — এঁদের কাব্যে সৃষ্টিতত্ত্বের দিকটি বিবৃত হয়নি। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গল কাব্যের কবি জগজ্জীবন ঘোষাল ও তন্ত্র বিভূতির কাব্যের সূচনায় সৃষ্টিতত্ত্বের বিস্তারিত বর্ণনা

রয়েছে। উত্তরবঙ্গের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কবি মানিক দত্ত তাঁর কাব্যও সূচনা করেন সৃষ্টিতত্ত্বের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে। সেই সৃষ্টিপত্তন কাহিনীতে বৌদ্ধশূন্যবাদ এবং বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার ছাপ সুস্পষ্ট। হরিদাস পালিত বলেছেন — ''বিশেষত্বের মধ্যে এই চণ্ডীর মধ্যে বৌদ্ধ শূন্যবাদ ও বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতের বহুল সমাবেশ দৃষ্ট হয়। সেই কারণে আমাদের মনে হয়, মঙ্গলচণ্ডীর গীতের প্রাধান্য সময়ে এদেশে বৌদ্ধভাবের সৃষ্টিপ্রকরণ এবং চণ্ডিকার উৎপত্তি সবিশেষ প্রচলিত ছিল। দেশের আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই সেই বৌদ্ধ তান্ত্রিকতামূলক সৃষ্টি প্রকরণ অবগত ছিল। সেই কারণে কবি বাধ্য হইয়া দেশীয় জনগণের মনস্তুষ্টি উদ্দেশে তাঁহার গীত গ্রন্থে স্থানীয় ধর্ম্মভাবই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।''[১] মানিক দত্তের এরূপ বর্ণনা রীতি মঙ্গলকাব্যের সাধারণ রীতি অনুযায়ী নতুন।

সেই সঙ্গে তাঁর কাব্যটি ব্রতকথার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সূচনা, সমাপ্তি ও সংযোগ রক্ষা হয়েছে। এই কাব্যের দেবদেবীর উল্লেখিত কাহিনী অংশ পুরাণ নির্ভর ও কাহিনী গ্রন্থনা আড়ষ্ঠ। এমনকি, তিনি মঙ্গলকাব্যের গঠনরীতি অনুসারে তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে সর্বপ্রথম বিভিন্ন দেবদেবীর বন্দনা রচনা করেন নি। তিনি তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনী সাজিয়েছেন 'সৃষ্টিপালা'র বর্ণনা দিয়ে। সৃষ্টিপালায় আদি-ধর্ম বা আদি-বুদ্ধ সৃষ্টির বাসনায় তার 'হাই' বা 'হাম্বি' থেকে আদি দেবী আদ্যার সৃষ্টি হয়। মানিক দত্তের কাব্যে এই আদ্যাই দেবী চণ্ডীতে পরিণত হয়েছে। কবির এই চণ্ডী ভাবনার সঙ্গে মালদহের ঐতিহ্যবাহী গম্ভীরার আদ্যার সাদৃশ্য লক্ষ্য করে হরিদাস পালিত বলেছেন — ''আদি বুদ্ধ বা আদিধর্ম্ম হইতে আদ্যা নামক এক শক্তির উদ্ভব দেখিতে পাইতেছি। এই আদ্যাদেবী ধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। মালদহের আদ্যার গম্ভীরায় সেই আদ্যার পূজা হইয়া থাকে। বৌদ্ধ আদ্যাদেবী বা চণ্ডী ক্রমশঃ আমাদের শ্রীশ্রীচণ্ডী দেবী হইয়া শিবসহ অর্চ্চিত হইতেছেন। মানিক দত্ত এই আদ্যার চণ্ডীত্ব প্রাপ্তির যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অদ্ভুত ব্যাপার।''[২] মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আদ্যার সপ্তজন্মের ঘটনা অভিনব। এই পর্যন্ত কাহিনী সরলরৈখিক। তার কার্যকারণ সম্পর্কের তুলনায় মধ্যযুগীয় বাতাবরণে অলৌকিকতাকেই বেশি স্থান দেওয়া হয়েছে।

কবি আদ্যার গৌরীরূপ ও পিতা হিমালয়ের সঙ্গে গৌরীর সম্পর্কের এক নতুন কাহিনী গড়েছেন, তা একান্ত কবির নিজস্ব। এই কাব্যে গৌরী হিমালয় ও মেনকার গর্ভজাত সন্তান নয়। গৌরী তাদের পালিত সন্তান। কবি এখানে লোক প্রচলিত কাহিনীকে গ্রন্থনায় যুক্ত করেছেন। পুরাণের এই ঘটনা কবির হাতে লোকপুরাণে পরিণত হয়েছে। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সম্পাদক সুনীলকুমার ওঝা 'ভূমিকা' অংশে বলেছেন — ''... মানিক দত্তের কাহিনী এইরূপ অনেকস্থলেই সংস্কৃত পুরাণ বা কাব্যকাহিনীর একান্ত অনুগত না হইয়া লোকশ্রুতির আশ্রয় লইয়াছে। মনে হয় মানিক দত্ত এইরকম অন্যান্য বহুস্থলেই নবপুরাণ সৃষ্টি প্রয়াসের সাক্ষ্য রাখিয়া গিয়াছেন। অথবা বলা চলে তিনি লোকপ্রচলিত কাহিনীকেই আশ্রয় করিয়াছেন।''[৩] মানিক দত্তের এই বর্ণনা

সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ভাবনা প্রসূত বলে মনে হয়।

শিবের বিবাহকে কেন্দ্র করে মানিক দত্ত পুরাণের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত দুটি উপকাহিনীর সংযোজন করেছেন। তার কৌশল রীতিও কবির নিজস্ব। তাতে কবি বুদ্ধিদীপ্ত কাব্যিক গুণের পরিচয় দিয়েছেন। শিবের ধ্যান ভঙ্গের প্রসঙ্গে কামদেব, রতি ও সরস্বতী প্রভৃতি চরিত্রে এসেছে বাস্তবতা ও করুণ রসের ছোঁয়া। এছাড়াও পুরাণের গঙ্গা ও শান্তনুর দাম্পত্য জীবনের উপকাহিনীটি মূল কাহিনীতে সংযোজন চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে একান্ত নিজস্ব পরিকল্পনা। শিবের অধিবাসের দ্রব্য সামগ্রী বাহক হিসাবে নারদ ও ভীম চরিত্রের ভূমিকা চমৎকার। এই চরিত্র দুটি কাব্যে পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী কার্যকলাপ আমাদের তাদের সম্বন্ধে পুরাণ সম্পর্কিত ধারণা জাগ্রত করে। বিবাহে জল সাধতে যেসকল পুরনারী মেনকার সঙ্গ দেয় তাদের এই গ্রন্থে লৌকিক নরনারী বলে মনে হয়। যথা — হিরা, তারা, সুরেশ্বরী, মোহিনী ও পিঙ্গলা। কিন্তু মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে মেনকার সঙ্গদাত্রী আইয়গণের নাম পুরাণ পরিচিত। মানিক দত্তের কাব্যে পিতা হিমালয়ের কোলে চড়ে শিশু দুর্গার বিবাহ মণ্ডপে আগমন এবং হিমালয়ের কন্যা-জামাতার গলায় মাল্য প্রদান কৌতূহলোদ্দীপক ও স্বতন্ত্র বটে। তাতে অতি বাল্য বয়সে বিবাহ রীতির প্রত্যক্ষ বাস্তব চিত্রের পরিচয় দিয়েছেন কবি।

হর-গৌরীর বিবাহের পর গণেশ ও কার্তিকের জন্ম বৃত্তান্ত প্রায় সকল কবিই বিবৃত করেছেন। তবে গণেশের জন্মের পর শনির আগমন ও তার দর্শনে গণেশের শিরচ্ছেদ এবং ইন্দ্রের হাতির মুণ্ডু তাতে স্থাপন বর্ণনা কেবল মাত্র মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেই লক্ষ্য করা যায়। ততে মানিক দত্ত এই দুটি জন্মরহস্য নিয়ে কাহিনীকে বর্ধিষ্ণু করেছেন। সেক্ষেত্রে কবি লোককৌতুহলকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। সেক্ষেত্রে তাঁর পরিচয় লোককবি হিসাবে।

তবে মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মধ্যে দেবী চণ্ডীর পৌরাণিক চেতনাগুলি পরিস্ফুট করে তার অলৌকিক মাহাত্ম্যের প্রতি মানুষকে মুগ্ধ করতে লাগল। তারফলে মানুষ দেবতার কাছে আত্ম সমর্পণ-প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে লাগল। তার উপর রাজনৈতিক জীবনের পরাজয় ও অসহায়ত্ববোধ এই ভাবকে আরও ঘণীভূত করল। সাধারণ বাঙালী গৃহস্থের ভোগলিপ্সা ও সুখমসৃণ জীবনচর্যার জন্য এই নতুন দেবীর কাছে সুবিধাবাদমূলক তৃপ্তি খুঁজে পেয়েছিল। তাই কবি মানিক দত্ত দেবীর পুরাণ-সম্পর্কিত প্রচলিত নিধনকারিনী রূপ প্রকাশের জন্য মূল কাহিনীর সঙ্গে অল্প সম্পর্কযুক্ত ঘটনার উপস্থাপন করেছেন। এই রকম অল্প সম্পর্কযুক্ত ঘটনা হল চণ্ডীর মধুকৈটভ, শুম্ভ-নিশুম্ভ নিধনের ঘটনা। সেক্ষেত্রে তিনি মধুকৈটভ নামক অসুরদ্বয়ের জন্মের কথা বলেছেন। প্রসঙ্গত, 'দেবী-ভাগবত'-এ উল্লেখ রয়েছে যে, এদের জন্ম হয় বিষ্ণুর কর্ণমূল থেকে। চণ্ডীর সঙ্গে তাদের এবং মহাবীজ, রক্তবীজের সঙ্গে যুদ্ধ বিবৃতি, যুদ্ধে ক্লান্ত চণ্ডীর গাত্রঘর্ম থেকে কালীর সৃষ্টি

এবং শুম্ভ-নিশুম্ভ নিধন ঘটনা কাহিনীতে জটিলতা এনে দিয়েছে। মানিক দত্তের কাব্যে এই কাহিনীর সঙ্গে মার্কণ্ডেয় পুরাণের বেশ সাদৃশ্য রয়েছে। এরূপ পুরাণ ঘটনার ব্যবহার মানিক দত্ত তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে অনুসরণ করলেও সেই বর্ণনার কৌশল লোকগল্পের বর্ণনার মত। প্রসঙ্গত, গৌড়ের ইতিহাসকার রজনীকান্ত চক্রবর্তী মুকুন্দ চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর বর্ণনা রীতি পার্থক্য লক্ষ্য করে বলেছেন — ''মুকুন্দরামের পৌরাণিক বর্ণনা হিন্দুপুরাণের অনুযায়িনী; কিন্তু মানিকদত্তের পুরাণ অতি অদ্ভুত।''[৪]

অসুর নিধনের পর পুত্রদের প্রতিপালনের জন্য চণ্ডীর ইন্দ্র-সভায় যাত্রা এবং পঞ্চদাসী প্রাপ্তির ঘটনা আশ্চর্যের। সেই পঞ্চদাসীগণ হল হারা, তারা, সত্যা, কমলা ও পদ্যা ইত্যাদি। অন্যান্য কাব্যে দেবী বিবাহের সময় কেবল তিনদাসী পায়। তারা হল জয়া, বিজয়া ও পদ্মা। মানিক দত্তের কাব্যের ঘটনাও স্বতন্ত্র এবং সেই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত চরিত্র পটভূমি ও চরিত্রের সংখ্যাও পৃথক। এই পঞ্চদাসীর প্রতি স্বামী শিবের সম্ভোগ বাসনা লক্ষ্য করে চণ্ডীর পূজা প্রচারের তথা স্বীয় প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা জাগ্রত হয়। এইরূপ কৌশলে কবিত্বের তেমন একটা ছাপ নেই বটে, কিন্তু চণ্ডীর মধ্য দিয়ে নারীর আত্ম প্রতিষ্ঠার দিকটি সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। সেই ইচ্ছার থেকে প্রথম চণ্ডীর সঙ্গে পদ্মা নামক সহচরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। পদ্মার স্থানে আগমন পথে তার সারথি ছিল ইমলা, বিমলা নামে দুটি নারী চরিত্র। পদ্মার কাছে সে জানতে পারে মর্ত্যে পূজা প্রচারের একমাত্র বাধা ধূম্রাসুরের নাম। এরপর যে দেবী কর্তৃক ধূম্রাসুর বধের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তা কবি মার্কণ্ডেয় পুরাণ থেকে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে গ্রহণ করেছেন। এমনকি, দেবী চণ্ডী পদ্মার উপদেশেই কলিঙ্গে দোহরা নির্মাণ করে কলিঙ্গরাজ কর্তৃক স্বীয় পূজা করিয়ে নেয়।

''পদ্বা বলে শুন মাতা মঙ্গলচণ্ডীগণ।
কলিঙ্গে দেহরা করাহ নির্ম্মান।।
সুরথ রাজার তরে স্বপ্ন দেখাহ তারে।
তোমার পূজা সব নরলোকে করে।।''[৫]

মানিক দত্তের এই বর্ণনা তাঁর নিজস্ব। মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যের কাহিনী গ্রন্থনায় ধূম্রাসুরের প্রসঙ্গ নেই। অন্যদিকে, দ্বিজমাধব অসুর দলনী চণ্ডীর দ্বারা মঙ্গলাসুরকে বধ করার প্রসঙ্গকে তাঁর কাব্যে স্থান দিয়েছেন। আর মানিক দত্ত দেবী চণ্ডীর উগ্রমূর্তিকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। এই নতুন দেবীর প্রতি মানুষের আশ্বাস যোগান ও ভরসা সৃষ্টির জন্য তাঁর কবিত্ব অসাধারণ।

শুধু তাই নয়, মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মূল বৈশিষ্ট্য হল কাব্যটি দেবী চণ্ডীর মাহাত্ম প্রচারের মুখাপেক্ষি করে হয়েছে কাহিনীর বয়ন। তিনি নিজেই যেভাবে মর্ত্যে দেবীর পূজা ও মাহাত্ম্য-কাহিনী প্রচার করেছেন, তা অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের বর্ণনা থেকে পৃথক। এই কাব্যে সতন্ত্র

কোন 'গ্রন্থোৎপত্তির কারণ' অংশ না থাকলেও কবি তার যে ব্যক্তি পরিচয় দিয়েছেন তা মধ্যযুগীয় সাহিত্যের একটি সনাতন ধারার অনুবর্তন। এখানে তাঁর গয়েনীরূপটি ফুটে উঠেছে। সেখানে চণ্ডী পদ্মার উপদেশে তাঁর দ্বারা ব্রতকথা প্রচারিত হয়েছে। পদ্মার উপদেশে দেবী মর্ত্যে মানিক দত্তকে দিয়ে তিন লক্ষ সংস্কৃত লাচাড়িকে বাংলায় তিন শত বত্রিশ লাচাড়ি লিখিয়ে ব্রতকথা সম্পূর্ণ করে।

''প্রভাতে উঠিয়া দত্ত পুঁথি দেখে নাড়ি।
তিনলক্ষ পুস্তক মধ্যে আছেন নাচাড়ী।।
তিনলক্ষ দূরে রাখি তিনশত কৈল।
বত্তীশ নাচাড়ী গীত অধিক রাখিল।।''[৬]

দেবী যে লোকভাষায় লিখিত কোন পুথি না দিয়ে সংস্কৃত পুথি মানিক দত্তের শিয়রে রেখে গেল, তাতে এ কাহিনীর পৌরাণিকতা ধরা পড়েছে। সেই সঙ্গে কবি দু'জন দোহারকে সঙ্গে নিয়ে কলিঙ্গে যাত্রা, কলিঙ্গরাজ কর্তৃক বন্দী এবং দেবীর কৃপায় উদ্ধার — এই বিস্তৃত আত্মকথনকে কবি তাঁর চণ্ডীমঙ্গলে তুলে ধরেছেন। নিজেকে কাব্যের একটি চরিত্র রূপে উপস্থাপিত করেছেন এবং নিজের হাতে স্বীয় কীর্তির কথা সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন। কলিঙ্গ রাজের দ্বারা দেবীর পুজায় তান্ত্রিক পূজা পদ্ধতির আভাস রয়েছে। সেই তান্ত্রিক পুজার হাত ধরে অবলীলাক্রমে এসেছে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে প্রচলিত লোকবাদ্য ও লোকনাট্য প্রসঙ্গ। যেমন, সারিন্দা, পীণাক ও নাটুয়া ইত্যাদি। তবে কলিঙ্গ রাজের পূজার পরও দেবী দশভুজ ও ত্রিনয়নের কারণ ও তাদের কার্যাবলীর পুঙ্ক্ষাণুপুঙ্ক্ষ বর্ণনা কাহিনী গ্রন্থনাতে এনেছে আড়ষ্ঠতা। সেই দিক থেকে কাব্যটিকে প্রচারমূলক কাব্য বললে, অসমীচীন হবে না।

কিন্তু উপকাহিনী নির্বাচনে কবি মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। শিব-শক্তির দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে বিজু বনের ঘটনাটি এসেছে। চরিত্রানুযায়ী সেই ঘটনার সঙ্গে যোগসূত্র থাকলেও বিজু বনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিবরণ তাঁর কবিত্ব শক্তির পরিচায়ক। শিব-গৌরীর দাম্পত্য জীবন মঙ্গলকাব্যের রীতি অনুযায়ী সন্নিবেশিত হলেও তা সংক্ষিপ্ত। হয়তো কবি বস্তু পৃথিবীর বাস্তব জীবনের তুলনায় অলৌকিক মহিমার বাতাবরণ সৃষ্টি করতে বেশি আগ্রহী ছিলেন। কবি গণেশ ও কার্তিকের জন্মের পর শিব-চণ্ডীর সংসার জীবনের মাঝে অনেক ঘটনাই অন্যান্য চণ্ডীমঙ্গল কাব্য থেকে আলাদা রকমের। দ্বিজমাধবের 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' কাব্যের সম্পাদক সুধীভূষণ ভট্টাচার্য মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সঙ্গত কারণেই বলেছেন — ''কাব্যটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল, ইহাতে নূতন নূতন motif স্থান লাভ করিয়াছে, মাধবানন্দ বা মুকুন্দরামের কাব্যে ঐ সকল গল্পাংশ পাওয়া যায় না।''[৭] শিব ভক্ত ইন্দ্রকে চণ্ডী ছলনা করে পুত্রবর দান করেছে। কবি এই

ঘটনায় কোন কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। কিন্তু ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বরকে নিয়ে শিব ও শক্তি তথা চণ্ডীর মধ্যে প্রকাণ্ড লড়াই এবং উভয়ের ঘর্ম থেকে ধর্মকেতু-নিশানকেতু ও নিদয়া-কমলার জন্ম হয়। এরূপ দেব-কাহিনীর সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত উপকাহিনী সৃষ্টি করে মানিক দত্ত অত্যন্ত কৌশলে ব্যাধখণ্ডে প্রবেশ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে স্বতন্ত্র করে 'দেবখণ্ড' নেই। 'দেবখণ্ড' থেকে কাহিনী কালানুক্রমিক ব্যাধখণ্ডে প্রবেশ করেছে। ব্যাধ ধর্মকেতু ও নিশানকেতুর সঙ্গে যথাক্রমে নিদয়া ও কমলার বিবাহ হয়েছে। ধর্মকেতু ও নিশান কেতুর অলৌকিক মায়ার প্রভাবে মৃত্যু হলেও তাদের স্ত্রীদের সমমরণ উচ্চবর্ণ সুলভ হিন্দু আদর্শ অনুসারে বর্ণিত হয়েছে। কবি যেন তাতেই সন্তুষ্ট। অতঃপর কালকেতু ও ফুল্লরার জন্ম। কালকেতুর জন্মের পূর্ব মুহূর্ত থেকে শুরু করে জন্মের পর পর্যন্ত যে সকল বর্ণনা কবি দিয়েছেন তার মধ্যে বাস্তব রসের পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষ করে কালকেতুর শৈশব-জীবনের অনুপম চিত্র বর্ণনায় কবি পুরাণ প্রভাবিত নন এবং তা একেবারেই নিরাভরণ। এরূপ একটি বৃত্তাকার প্লট মানিক দত্ত সুন্দর ভাবে তাঁর কাব্যে স্থান দিয়েছেন। এক্ষেত্রে যে সকল চরিত্র কাহিনী এসেছে তাদের মধ্যে কমলা চরিত্রটি দ্বিতীয় রহিত।

অতঃপর মানিক দত্ত কালকেতু ও ফুল্লরার দাম্পত্য জীবনের বিভিন্ন ঘটনায় লৌকিক কবির পরিচয় দিয়েছেন। তার চিত্রিত কালকেতুর সঙ্গে ফুল্লরার দাম্পত্য জীবনের করুণ কাহিনীর ছাপ পড়েছে। কিন্তু তিনি কেবল দম্পত্য জীবনের করুণ কাহিনী তুলে ধরেন নি, সেই সঙ্গে সমকালীন সমাজের প্রয়োজনে বহু তথ্য তুলে ধরেছেন স্বচ্ছন্দভাবে। তাঁর কৃতিত্ব কেবল বাস্তব-রস পরিবেশনে, বস্তু সঞ্চয়ে তেমন নয়। তাঁর কাব্য থেকে যে সমকালীন সামাজিক অবস্থার প্রচুর উপকরণ সংগ্রহ করা যায় তার অন্তরালাশ্রয়ী মর্মস্পন্দন চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে। কালকেতুর পশু শিকারের বর্ণনায় বাঘের বিভিন্ন দেহাবশেষ দ্বারা বিভিন্ন প্রকার লোক ঔষধ তৈরী ও তার প্রয়োজনীয়তার কথা সেই প্রমাণ দেয়। কাহিনী ধারায় এরূপ বাঘের দেহাবশেষের উপকারিতা সম্বন্ধে কবি লোক সাংবাদিকতা করার ফলে গ্রন্থনা রীতি অনেকটাই শিথিল হয়ে পড়েছে। কবির ভাষায় —

''একাক ব্যাঘ্র বধ কৈলে জতেক কার্যেত লাগে
তাহার লেখা জোখা বলি।''[৮]

মুল কাহিনী ধারা থেকে বেরিয়ে এসে সাধারণ মানুষ তথা শ্রোতাগণকে বাঘের দেহাবশেষের সম্পর্কে সচেতন করা লোক কবি বা গায়েনী রীতির লক্ষণ বলে মনে হয়। ব্যাধ জীবন ও চরিত্রের মধ্যে লোককবির গভীর অনুপ্রবেশ না থাকলেও তাঁর বর্ণনাকে যে বাস্তব সত্য করে তুলেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে যে পরিমিতিবোধের জন্য উত্তম সৌন্দর্যের স্রষ্টা ও কবিত্বগুণ

ফুটে ওঠে তা তাঁর কাব্যে তেমন স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পায়নি। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এ ধরনের বৈশিষ্ট্য মাঝে মাঝেই প্রকাশ পেয়েছে।

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অপর একটি মূল্যবান ও দৃষ্টি আকর্ষক বৈশিষ্ট্য হল প্রবল রামভক্তিবাদের প্রভাব। সমকালীন জন-মানসে প্রচারিত ও প্রভাবিত রামভক্তিবাদকে কবি সমগ্র কাহিনীর মধ্যে অত্যন্ত চমৎকার করে প্রয়োগ করেছেন। এইরূপ একটি রাম ভক্তিবাদের উল্লেখ পাই বনে পশু শিকারের মুহূর্তে। এখানে কবির সমাজ ও জীবন সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা সুপ্রচুর, অথচ কবি স্বভাব অনুসারেই তিনি মানবিকতার পন্থী, আর এরই সঙ্গে তিনি ভাষা ও বর্ণনা রীতির অদ্ভুদ সমন্বয় ঘটিয়েছেন। কবির বর্ণনাটি অত্যন্ত সহজ-সরল এবং অলংকার বর্জিত। সাধারণ মানুষের মুখের ভাষাই তাঁর কাব্যে পদ্যের আকারে রূপ পেয়েছে। তবে পশুগণের সঙ্গে কালকেতুর সমরে যাত্রা এবং যুদ্ধে পরাজিত পশুগণের ক্রন্দন এখানে বিবৃত হয়নি। কালকেতুর বাণে বিদ্ধ হরিণীর মৃত্যু মুহূর্তেও রামনামের কথা শোনা যায়। কালকেতুর শিকারে অত্যাচারিত পশুগণ দেবীকে তাদের করুণ কাহিনী জানায়। মানিক দত্তের কাব্যে তা সংক্ষিপ্ত, তেমন জীবন্ত নয়। কবি যেন তাদের পশু করেই রেখেছেন, মানবিক গুণ সম্পন্ন করে তুলতে পারেন নি।

এর পরেও কবি কাহিনী ধারায় কার্যকারণ সম্পর্কের ছেদ রক্ষা করতে পারেন নি। তিনি কালকেতুর ভোজন বর্ণনা করেছেন। ভোজনের পর কালকেতু পশু শিকারের জন্য বনে যাত্রা করে। সেখানে মানিক দত্ত এক অভিনব কৌশল অবলম্বন করেছেন এবং ব্যাধখণ্ডের প্রধান চরিত্র কালকেতুকে জীবন্ত করে তোলার অবকাশ রেখেছেন। সে শৈশব থেকেই শক্তিশালী ও বীর। কবি তার চরিত্রে কৃষ্ণের বাল্য ছায়া পড়তে দেয়নি। একজন ব্যাধ বালক যেভাবে বড় হয় ঠিক তার জীবন্ত প্রতিফলন ঘটেছে কালকেতুর ক্ষেত্রে। বনে কালকেতুর সঙ্গে নামহীন যে বেনিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় সে কবির নিজস্ব সৃষ্টি চরিত্র। সেখানে কবি কালকেতুর মত নিম্নশ্রেণীর চরিত্রে মধ্যবিত্ত মানসিকতা ফুটিয়ে তুলেছেন। সে যাইহোক, সেই বনের পশুদেরকে রক্ষার জন্য দেবী চণ্ডীও তাকে ছলনার জন্য তুচ্ছ একটি কৌশল অবলম্বন করে। সেটি হল কালকেতুর চোখে ধুলো দেওয়া। এরূপ হাস্যকর ও লৌকিক ঘটনার দ্বারা কাহিনীকে কবি নিয়ন্ত্রণ করেছেন।

তথাপি শ্রীকলার বাজারে ফুল্লরার মাংস বিক্রয়ের মধ্য দিয়ে নিম্নশ্রেণীর ব্যাধ সমাজের চরম বাস্তব চিত্র তুলে ধরতে কবি সক্ষম হয়েছেন। সেই সঙ্গে কবির দারিদ্র জীবনের প্রতি আত্মধিক্কারের মাধ্যমে তাদের সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে। ফুল্লরার দুঃখময় দাম্পত্য জীবন থেকে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছাবার নতি কথায় কবির রোমান্টিক জীবন ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। লক্ষণীয়, মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে পশুদের সঙ্গে কালকেতুর যুদ্ধের বর্ণনা নেই। এমনকি তাঁর কাব্যে পশুগণের গোহারী অংশ এবং সমকালীন বাস্তবতার ছোঁয়ায় তা জীবন্ত

হওয়ার কোন ঘটনা নেই। বরং কবি পশুদের করুণ কাহিনীর দৃশ্য বিবৃত করে দেবী চণ্ডীর মহিমাকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। সে কারণে হয়তো চার প্রকার কাচুলি নির্মাণের কথা এত বিস্তারিত এবং তা লোক উপাদানে পূর্ণ। সেই কাচুলি নির্মাণে চকা-চকি পাখির প্রসঙ্গে রামায়ণের নীতিগান করা লোককবির পরিচায়ক। সমস্ত বিষয়ই দেবীর প্রতি শ্রোতা বা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার কবির অভিপ্রায় ছিল একথা বললে অত্যুক্তি হয় না।

ছদ্মবেশী ষোড়শী রমণী দেবী চণ্ডীকে দেখে ফুল্লরার সতীন মনে করা ও বারমাস্যার কথা বলা মঙ্গলকাব্যের বর্ণনা রীতির একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। তবে সতীন ভাবনায় শঙ্কিত ফুল্লরার প্রথমে বৃদ্ধা মাসীর কাছে যাওয়া কবির নিজস্ব সমাজ অভিজ্ঞতা জাত তা বলা যায়। এরপর চণ্ডী ফুল্লরার দাম্পত্য জীবনের দুর্বলস্থানে আঘাত করে। এটি হল ফুল্লরার বন্ধ্যাত্বতা। তাকে কেন্দ্র করেই এই কাব্যে 'ফুল্লরার বারোমাস্যা' অংশটি উপস্থাপিত হয়েছে কার্যকারণ সূত্রের হাত ধরে। দেবী তার দুই পুত্রকে নিয়ে কালকেতুর সঙ্গে অতিরঙ্গে সংসার করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। এবং সেক্ষেত্রে ফুল্লরা হবে তার দাসী। দেবী ফুল্লরাকে বলে —

''দুই পুত্র কোলে করি কেতুর আগে শুইব।
তুমি পায়ে তৈল দিবা আনন্দে থাকিব।।
আলস্য লাগিলে জাতিবে হস্ত পাও।
গ্রীষ্ম লাগিলে দিবে দণ্ড পাখার বাও।।''[৯]

অতঃপর গ্রাম্য গৃহবধূর ন্যায় ফুল্লরার ক্রোধ প্রকাশ এবং বারমাস্যা বর্ণনা স্বাভাবিক। ব্যাধ জীবনে বারমাসের দুঃখ-কষ্ট ঘটা করে বর্ণনা করা ফুল্লরার গৃহস্থলীয় রিক্ততা ও তার জীবন সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতি নয়, অবাঞ্ছিত আগুন্তুককে বিদায় দেবার কৌশল মাত্র। কবির বর্ণনা রীতি এখানে স্বতন্ত্র মাত্রা পেয়েছে। তবে চরিত্রের আচরণে গ্রাম্যতার স্পর্শ আছে। তিনি ফুল্লরার বারমাস্যা বৈশাখ থেকে সূচনা না করে জ্যৈষ্ঠ থেকে শুরু করেছেন এবং সমাপ্ত করেছেন বৈশাখ দিয়ে। দেবীর প্রতি তাদের প্রত্যয় জন্মানোর জন্য দেবী চণ্ডীর যে রূপ প্রদর্শন করা হয়েছে তাতে তার মাতৃরূপিনী তন্ত্রের স্বরূপটি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

''ক্রোধে কালিকা জে মরায়ে দিল পাও।
বিকট দশন হৈল দশভুজা মাও।।
জিহ্বা হৈল লহ ২ মুখ ঘোরতর।
দেখিতে ২ ঐরি জায়ে যম ঘর।।''[১০]

এইরূপ দেখে কালকেতু ও ফুল্লরা মূর্ছিত হয়। সেই প্রচণ্ডা শক্তিদেবী তাদের মাতৃসুলভ স্নেহে কোলে তুলে নেয়। আদিম কৌম সমাজে দেবীর মাতৃতন্ত্রের প্রাধান্য ছিল। এই কাব্যে শক্তিরূপের

সঙ্গে স্নেহময়ী কল্যাণরূপটি সহাবস্থানে তন্ত্রের দেবী ভাবনার স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গত, বাঙালীর ইতিহাসকার ও প্রখ্যাত সমাজ গবেষক নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন — ''আদিম কৌম সমাজের মাতৃকাতন্ত্রের দেবীদের প্রাধান্য কৌম সমাজে তো ছিলই; বিচিত্র নামে তাঁহার নানাস্থানে পূজাও লাভ করিতেন। পরে যখন আর্য-ব্রাহ্মণ্য পুরুষ প্রকৃতি ধ্যান সুপ্রতিষ্ঠিত হইল তখন সেই মাতৃকাতন্ত্রের দেবীরা প্রকৃতি বা শক্তিরূপিনী বিভিন্ন দেবীর সঙ্গে, বিশেষ ভাবে দুর্গা ও তারা সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গেলেন।''[১১] দেবী কালকেতু ও ফুল্লরাকে তার যে পুরুষ-প্রকৃতির গূহ্য রহস্যের স্বরূপ-কথা বলে তাতেও কবি চণ্ডী ভাবনায় তন্ত্রকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। কবি হয়তো সমকালীন যুগ-চেতনাকে চণ্ডীর এরূপ বৈশিষ্ট্যে প্রকট করতে চেয়েছেন।

দেবী কর্তৃক প্রাপ্ত ধন বিক্রি করে ঘন্‌তা-কোদাল কেনার জন্য প্রথমে চাষাড়িয়ার কাছে এবং পরে বণিক পুরাই দত্তের কাছে কালকেতুর যাত্রার ঘটনা রয়েছে। দেবীর অঙ্গুরীর মূল্য পুরাই দত্তের মত বাণিয়ার অনুধাবন করা দুঃসাধ্য। তা কল্পনাতীত ও মহামূল্যবান বোঝাতেই পুরাই দত্তের প্রয়োজন হয়েছে এই কাব্যে। পরবর্তী কবিদের কাব্যে এভাবে ঘটনাটি দেখা যায় না। তাতে কবি ঘটনাতে জটিলতা বৃদ্ধি করেছেন। এমনকি পুরাই দত্ত চরিত্রটি তাঁর কাব্যে নিষ্প্রভ।

ধনপ্রাপ্তির পর কালকেতুর দেবীর শতনাম এবং তার স্বরূপ জানতে চাওয়ার ঘটনা কাহিনী ধারায় বাধা সৃষ্টি করেছে। সেই শতনামের মধ্যে দেবীর একটি নাম আঞ্চলিক প্রভাব জাত। সেটি হল 'দ্বারবাসিনী'। উত্তরবঙ্গের মালদহ জেলায় এই 'দ্বারবাসিনী' দেবী মন্দিরের অবস্থান রয়েছে।

''জক্ষিনী ত্রিপুটা ত্রিনেত্রা সঙ্কটা
শতভূজা দ্বারবাসিনী।''[১২]

এই শতনামের উল্লেখ 'দেবীপুরাণ' গ্রন্থেও লক্ষ্য করা যায়। যাইহোক, সেই ধন-সম্পদের পূজা করার ঘটনাটিও কাহিনী গ্রন্থনায় অভিনব। কালকেতু দেবীর কথায় প্রাপ্ত ধনের পূজা করে।

''জঙ্গলের পুষ্প তুলি আনিল বিস্তর।
ধন পূজা করে বীর অক্ষটী কুঙর।।
এক অঞ্জলি পুষ্প তুলিল হৃদয়ে।
আস্থা করি দিল পুষ্প চামুণ্ডার পায়ে।।
বীর পূজা করে রামা দেয় জয়ধ্বনি।
ধন সহিত আনন্দ হৈইল নারায়নী।।''[১৩]

দেবীর সঙ্গে বনদুর্গার মিশ্রণ ঘটেছে। এই দেবী ভাবনায় মানিক দত্ত ব্রাহ্মণ্য ও লৌকিক সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটিয়েছেন। প্রসঙ্গত, বাঙালীর ইতিহাস রচনাকার ও প্রখ্যাত সমাজ গবেষক নীহাররঞ্জন রায়ের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য বলে মনে হয় — '' 'গ্রাম-দেবতা' সর্বত্র একই নামে বা একই রূপে

পরিচিত নহেন; সাম্প্রতিক বাঙলায় কোথাও তিনি কালী, কোথাও ভৈরব বা ভৈরবী, কোথাও বনদুর্গা বা চণ্ডী, কোথা বা অন্য কোনও স্থানীয় নামে পরিচিত। কিন্তু যে নামেই পরিচিত তিনি হউন, পুরুষ বা প্রকৃতি-তন্ত্রেরই হউন, সংশয় নাই যে, সর্বত্রই তিনি প্রাক্-আর্য আদিম গ্রামগোষ্ঠীর ভয়-ভক্তির দেবতা। আদিবাসীদের এই সব গ্রাম্য দেবতাদের প্রতি আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি খুব শ্রদ্ধিতচিত্ত ছিল না। ... শীতলা, মনসা, বনদুর্গা, ষষ্ঠী, নানা প্রকারের চণ্ডী, নরমুণ্ডমালিনী শ্মশানচারী কালী, শ্মশানচারী শিব, পর্ণশবরী, জাঙ্গুলী প্রভৃতি অনার্য গ্রাম্য দেবদেবীরা এইভাবেই ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মকর্মে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিলেন বলে মনে হয়।''[১৫] ঘটনার মধ্য দিয়ে এমনভাবে মিশ্র সংস্কৃতির দেব ভাবনার প্রকাশ মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যকে আলাদা মাত্রা দান করেছে। এমনকি সামাজিক পরিচয়ে নিম্নস্তরের ব্যাধ হঠাৎ দেবীর কৃপায় উচ্চবিত্তে পরিণত হলে শাসক শ্রেণীর করাল শাসনের কবলে পড়তে বাধ্য। এরূপ চিরন্তন সত্য থেকেও অভয় দিয়ে থাকে দেবী চণ্ডী।

দেবীর চণ্ডীর কলিঙ্গভাঙন ও গুজরাট রাজ্য পত্তনের বর্ণনা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে প্রথাগত রীতি অনুসারে বিবৃত করা হয়েছে। তবে বর্ণনার কৌশল বিভিন্ন কবির ভিন্ন। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে সেই ভিন্নতা কিঞ্চিৎ পরিলক্ষিত হয়। কলিঙ্গরাজ্য ভাঙনের ঘটনা বর্ণনায় কবি চরিত্রকে মানবিক ও দ্বন্দ্বসম্পন্ন করে তুলেছেন। তার পরিচয় পাই চণ্ডীর ইন্দ্রের সভায় আগমনে ইন্দ্রের তার প্রতি আতিথেয়তায়। কবির ভাষায় —

''মাথে করি নিল ইন্দ্র দিব্য সিংহাসন।
সমুখে আসন থুইয়া বন্দিল চরণ।।''[১৫]

চণ্ডী কলিঙ্গভাঙনে সর্বপ্রথম পদ্মার উপদেশে নয়, মানিক দত্তের কাব্যে সে নারদের উপদেশে ইন্দ্র সভায় যায়। যেখানে আট প্রকার মেঘ দেবী আনে। তারা হল হুরুকা, দুরুকা, আবর্ত, সামর্ত, কালাপাহাড়, আন্ধারিয়া, কালিয়া ও সিন্ধুরিয়া ইত্যাদি। অন্যান্য চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কেবল চার প্রকার (পুণ্ডরীক, পুষ্কর, আবর্ত ও সম্বর্ত) মেঘের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু মানিক দত্তের কাব্যে অতিরিক্ত যেসকল মেঘের নাম রয়েছে সেগুলিও লোকবিশ্বাস থেকে সৃষ্ট। তার ফলে তাঁর কাব্যে লোকবিশ্বাস যুক্ত মেঘের অতিরিক্ত নামের ঘটনার ঘনঘটা প্রকাশ পেয়েছে। এরা ব্যর্থ হলে মানিক দত্তের চণ্ডী গঙ্গার দ্বারস্থ হয়েছে। গঙ্গার সঙ্গে চণ্ডীর সতীন সম্বন্ধকে কবি সন্নিবেশিত করেছেন। তাই এই কাব্যেও গঙ্গার কাছ থেকে বিফল মনোরথ হয়ে গঙ্গার পুত্র ডাক-ডেউরের কাছে উপস্থিত হয়। কবির ভাষায় —

''ইন্দ্র বলে মাও মঙ্গলচণ্ডীগণ।
সাতাইল পর্ব্বতে মাত করহ গমন।।

ডাক ডেউর নামে আছে গঙ্গার নন্দন।
তাক লইয়া যাহ মাও কলিঙ্গ ভুবন।।''[১৬]

এখানে সমুদ্র দ্বারা নয়; ডাক ও ডেউর নামক গঙ্গার পুত্রদ্বয় দ্বারা কলিঙ্গে বন্যা সৃষ্টি করা হয়েছে, যা এই কাব্যে ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। এই ঘটনা ও চরিত্র দুটি কবির একান্তই নিজস্ব সৃষ্টি বলে মনে হয়। তবে ভাঁড়ু দত্ত চরিত্রটি সকল চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের একটি উল্লেখযোগ্য অপ্রধান চরিত্র। তার দ্বারাই কাহিনীতে দ্বান্দ্বিক পরিবেশের সূচনা। এই চরিত্রটি সৃষ্টিতে মানিক দত্ত ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। অন্যান্য চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মত ভাঁড়ু দত্ত কেবল কূটকৌশলী নয়, সে একজন শক্তিমান পুরুষ বটে। দেবীর সঙ্গে তার লড়াইয়ের চিত্রে তা ফুটে উঠেছে —

''নড় দিয়া ভাড়ু দত্ত ঘরে প্রবেশিল।
শিব মন্ত্র জপিয়া ভাড়ু হুরুকা লাগাইল।।''[১৭]

সে শিব ভক্ত। শিবই তার আত্মশক্তির মূল উৎস। কবির সৃষ্ট এই চরিত্র সম্বন্ধে প্রখ্যাত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার সুকুমার সেন বলেছেন — ''মানিক দত্তের রচনায় ভাঁড়ু দত্ত শক্তিমান পুরুষ, একেবারে ভাঁড় নয়।''[১৮] এই ভাঁড়ু দত্তের দ্বারা কাহিনী অগ্রগতি এবং দেবীর ব্রতকথা মর্ত্যে প্রচারের উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয়েছে। সেইজন্য দেবী চণ্ডীকে নারদ বলে —

''ঠগঠামন হৈতে অনেক কম্ম হএ।
ভাড়ু মরিলে মা তোমার বর্ত্ত হবার নএ।।''[১৯]

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের উদ্দেশ্য চণ্ডীর ব্রতকথা প্রচার করা। পুরাতন ঐতিহ্যবাহী ভাবনার ক্রমবিলোপ এবং নতুন লৌকিক অথচ শক্তিময়ী দেবীর প্রতি আস্বাস বৃদ্ধির দিকটি ভাঁড়ু দত্তের সঙ্গে চণ্ডীর লড়াইয়ের প্রতিয়মান অর্থ। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য মুদ্রিত হয়ে প্রকাশের পূর্বে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন — ''বোধ হয় মূল পাঁচালিটি ব্রতকথা জাতীয় ছিল।''[২০] মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এই ব্রতকথার রূপটি প্রকাশ পেয়েছে। তবে এই কাব্যে ভাঁড়ু দত্তকে শায়েস্তা করতে দু'বার ইন্দ্রের স্বর্গপুরে যাত্রা, একবার গঙ্গার কাছে এবং শেষে গঙ্গার পুত্র ডাক-ডেউরের কাছে যাত্রা প্রভৃতি কাহিনী গ্রন্থনায় কার্যকারণ সম্বন্ধ থাকলেও জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কবির বর্ণনা কৌশলে চরিত্র ও ঘটনাগুলি প্রত্যক্ষ জীবন্ত রূপ পেয়েছে। কাহিনী ধারায় দেবীর মাহাত্ম্য গীত প্রচারের প্রতিস্পর্দ্ধি ধর্ম হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করেছে ভাঁড়ু দত্ত। সমাজে বহুকাল স্থায়ী শৈব ধর্মের উত্তরে শাক্ত ধর্মের প্রতিষ্ঠা হল। সেই শাক্ত ধর্মের ধারক ও বাহক দেবীর ভক্তকূল। আর এই অনার্য দেবীর শ্রেণীহীন ক্ষেত্র গুজরাট নগর। সেই গুজরাট নগরে মাছুয়ানীর অভিযোগকে কবি কালকেতু ও ভাঁড়ু দত্তের মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণ হিসাবে নির্বাচন করেছেন। কবির এধরনের বর্ণনা এবং চরিত্রের মধ্যে নাটকীয়তা প্রকাশ পেয়েছে।

তবে, কলিঙ্গের চারজন সর্দারের সঙ্গে কালকেতুর যুদ্ধ বর্ণনা বিস্তারিত। চারজন সর্দার কর্তৃক কালকেতুর চারদ্বারের জয়ের কথা গতানুগতিক। কিন্তু কবি চারজন সর্দারের নাম এবং নামের সঙ্গে তাদের শক্তি, বুদ্ধি ও বিশালতা প্রকাশে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। এদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় কবি কাহিনী গ্রন্থনাকে শিথিল করলেও তা অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক করে তুলেছেন। দ্বিজমাধব রচিত 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' গ্রন্থের সম্পাদক সুধীভূষণ ভট্টাচার্য ভূমিকা অংশে মানিক দত্তের বর্ণনারীতির সম্বন্ধে বলেছেন — ''ইহার ভাষা তেমন মার্জ্জিত নহে ও ছন্দ অধিকাংশ স্থলে শিথিল, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বর্ণনা ভঙ্গী বেশ চিত্তাকর্ষক।''[২১] পাশাপাশি, যুদ্ধের প্রাক্কালে অপর একটি চমৎকার ঘটনা কবি তুলে ধরেছেন। কালকেতুর পূজা পেয়ে প্রসন্ন দেবী 'হিরিমকসের চাল' তাকে প্রদান করে। সেই চালে দেবীর শক্তিরূপের চার অবতারের আত্মপ্রকাশ রয়েছে। সেই চার অবতার হল শৃগাল, শকুন, সিংহ ও প্রেত। যুদ্ধে দেবীর ভয়ঙ্কর রূপ ও 'হিরিমকসের চাল'-এর বর্ণনায় কবি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। পাশাপাশি, তন্ত্র প্রভাবিত গৌড়বঙ্গের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য কবির এই বর্ণনায় সুস্পষ্ট। প্রসঙ্গত, যুদ্ধে কালকেতুর আত্মশক্তির প্রতি নববিশ্বাস জন্মানো এ কাব্যে নতুন বিষয়। সে বলে —

''তিন দ্বার জিনিলাম দুর্গার বাহুবলে।।
আপনার বল কিছু না বুঝি আপনি।
কত কাল আমার শএ থাকিবে ভবানী।।''[২২]

এখানে কবি মানিক দত্তের সৃষ্ট কালকেতু চরিত্রের সঠিক বিকশের পথ ছিল। কিন্তু কবি তার মত ব্যাধ চরিত্রকে বেশি গুরুত্ব না দিয়ে চণ্ডী চরিত্রের ভিন্ন রূপ প্রকাশে আগ্রহী হলেন। যুদ্ধে কালকেতু রক্তাক্ত ও সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লে তার উপর দেবী বাম পা রাখার ঘটনাটিতে 'ছিন্নমস্তা' কালীর রূপটি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। কবির বর্ণনা এরূপ —

''বাম পা খানি উদর মাঝারে দিয়া।
দক্ষিন হস্তে শেল গাছ তুলিল টানিয়া।।
আপনার পদ্ম পাও বীরের মাথাএ দিল।
এক গুন বল ছিল দশ গুন হৈল।।
লোকে বলে আইল ছিন্ন মস্তকা।।''[২৩]

সে যাইহোক, বর্ণনার বিষয় হয়তো সকল কবির কাব্যে একই, কিন্তু সেই ঘটনা বর্ণনায় দৃষ্টিভঙ্গি গত প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। এই বর্ণনায় দেবী চণ্ডীর স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে।

কালকেতুর সঙ্গে দ্বন্দ্বের পর ভাঁড়ু 'আটকুড়া' অপবাদকে কেন্দ্র করে কবি কাহিনী সমাপ্তির দিকে যাত্রা করেন। সেক্ষেত্রে তিনি সমাজের এই বন্ধ্যাত্বকে কাজে লাগিয়েছেন। তার ফলে

কালকেতু ও ফুল্লরা রাজ্য ভোগ ত্যাগ করে দেবীর পূজার জন্য গঙ্গারণ তীরে উপস্থিত হয়। কিন্তু দেবী চণ্ডী গৃহবধূর ছদ্মবেশে তাদের পূর্বস্মৃতির মধ্য দিয়ে কেবল মাতৃসত্তা ও পিতৃসত্তার জাগরণ হয়েছে। কবির এখানে সামাজিক সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। কালকেতুকে সন্তান প্রদান করলে কাহিনী গ্রন্থনা শেষে কীরূপ হত সে বিষয়ে মানিক দত্ত হয়ত স্থির করতে পারেন নি। তাই তারা সকলে স্বর্গে যাত্রা করে। এভাবে কাহিনী যেখান থেকে সূত্রপাত হয়েছে সেখানে গিয়ে পরিসমাপ্তি লাভ করেছে। মানিক দত্ত কার্যকারণ সূত্রকে তথা দেবী চণ্ডী কর্তৃক পূর্ব ঘটনা স্মরণ করে দেওয়ার ঘটনাটি সন্নিবেশিত করে কাহিনীকে স্বর্গাভিমুখি করে তুলেছেন। এখানে মানিক দত্ত ব্যাধ খণ্ডের কাহিনীকে বৃত্তাকার প্লটের রূপদান করেছেন। সেই সঙ্গে উল্লেখিত ব্রতকথার দিকটিকে অপর একটি কাহিনীতে যাত্রার কারণ হিসাবে নির্বাচন করেছেন। চণ্ডীর কথায় —

''চারিদিনের ব্রতকথা সমাপ্ত হইল।।
চারিদিনের ব্রতকথা সমাপ্ত করিঞা।
বসিলা ভবানী দেবী চিন্তাযুক্ত হয়া।।''[২৪]

মানিক দত্ত আট দিনের পাঁচালী গাওয়ার রীতিকে ষোলটি পাল্লায় বিভক্ত করেছেন। সেই পাঁচালী ব্রতকথার রীতিতে রচিত। এসকল দিকগুলি মানিক দত্তের কাব্যে অভিনব।

অতঃপর কবি দুটি স্বতন্ত্র খণ্ডের মধ্যেই যোগসূত্র গেঁথে দিয়েছেন ব্রতকথার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। চারদিনের ব্রতের প্রচার সমাপ্ত করে বাকী চারদিনের ব্রতকথার প্রচার প্রয়োজন বোধ থেকেই কবি অপর একটি আলাদা খণ্ডের সূচনা করেছেন। তবে ধনপতি খণ্ডে অনেকটাই কার্যকারণ সম্পর্কযুক্ত কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে। এখানে দেবীর নিয়ন্ত্রন তুলনামূলক ভাবে অনেক কম। এই খণ্ডের কয়েকটি কবি কৃতিত্বের পরিচয়ও রয়েছে। আখেটিক খণ্ডে ঘটনার দ্বারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে চরিত্রগুলি পরিচালিত হয়েছে। চণ্ডীকে যে কোন প্রকারে ঐশ্বর্যশালী ও শক্তিরূপিনী করে তোলাই কবির লক্ষ্য ছিল। আর বণিক খণ্ডে এসেছে দাম্পত্য জীবনের ঘটনা। সেখানে দেবীর নিয়ন্ত্রণ থাকলেও কবি এখানে চরিত্রকে প্রাণবন্ত ও কাহিনী গ্রন্থনার অনুগামী করে তুলেছেন। বণিক খণ্ডের সূচনায় বলা হয়েছে —

''চারিদিনের ব্রত মাতা মর্থে সৃজিয়া।
বসিল চামুণ্ডা চণ্ডী হেট মুণ্ড হৈয়া।।''[২৫]

সেকারণে স্বর্গের শিব-শিষ্য কর্ণমুনিকে দেবীর ছলনা এবং সেই ছলনায় দেবী সরস্বতীর সাহায্য নেওয়ার ঘটনা এসেছে। সরস্বতীর দ্বারা কর্ণমুনিকে মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ার ঘটনাও অভিনব বটে। তবে লক্ষণীয়, এই কাব্যে ছাড়া সরস্বতীর কাক বাহন স্বরূপটি অন্যত্র পাওয়া যায় না।

''সরস্বতীর তরে দুর্গা করিল স্মরণ।

শীঘ্রগতি আইল দেবী কাগ বাহন।।''[২৬]

সরস্বতী ঋগ্‌বেদের দেবী। তার সঙ্গে কাকের সংযোগে আর্য-অনার্যের তথা ব্রাহ্মণ্য ও লৌকিক সংস্কৃতির সমন্বয়ের সুর অনুমান করা যায়।

ছলনার দ্বারা শিব-শিষ্য কর্ণমুনি অভিশপ্ত হলে শিব ক্রুদ্ধ হয়। শিব তার পূজা সম্বন্ধে আত্মস্থ করার জন্য অত্যন্ত কৌশলে দেবী চণ্ডী 'হরগৌরী'র মিলিত অদ্বয় স্বরূপকে তুলে ধরেছে।

''হরগৌরী দুই করি জানে জেইজন।
দ্বিতীয় ভেদ করিলে তার নরকে গমন।।
অভেদ মূরতি এই গৌরী শঙ্কর।
বাম অঙ্গ গৌরী দক্ষিন অঙ্গ হর।।''[২৭]

এই অভেদ তত্ত্বই শিবের বিরূপ ভাবনাকে পরিবর্তনের কারণ। এই সকল ঘটনা পরবর্তী চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে নেই। এখানে কাহিনী গ্রন্থনে কবির কৌশলী ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

মর্ত্যে কর্ণমুনির ধনপতি নামে জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনা কবির নিজস্ব, তা কাহিনী ও চরিত্রের মূল উৎসকে নির্দেশ করে। কর্ণমুনি চরিত্রটিকে মানিক দত্ত নতুন সংযোজন করেছেন। এছাড়া লহনার জন্ম বৃত্তান্তও অন্যত্র পাওয়া যায় না। সাতবছর বয়স থেকে তার চণ্ডীর ব্রতপালনের বর্ণনার মধ্য দিয়ে কবি চরিত্রের বাল্য পরিচয় দান করেছেন। এমনকি লহনার সঙ্গে ধনপতির বিবাহে যেসকল নিয়মনীতির কথা এসেছে তাও আশ্চর্যের। বিবাহে ব্রাহ্মণের বেদমন্ত্র উচ্চারণ ও দানে দাসী প্রদানের রীতি আর্য সংস্কৃতির পরিচায়ক। বিবাহের পর দেবী চণ্ডীর প্রতি অন্যমনস্কতাকেই লহনার নিঃসন্তানের কারণ হয়েছে। চরিত্রের মধ্যে পূর্বে দুর্বলতার সূত্র নির্দেশ করে তারপর সেই চরিত্রের পরিবর্তন এবং তাতে চণ্ডী কর্তৃক অভিশাপ দানের মধ্য দিয়ে কাহিনীর মোড় ঘোরানো কবির সুন্দর গ্রন্থনা কৌশল বলা যায়। লক্ষণীয়, ধনপতির দ্বিতীয় বিবাহের আগে এই সকল ঘটনা অন্যত্র লক্ষ্য করা যায় না। এমনকি ধনপতির মাতা উর্বশী চরিত্রটিও অন্যত্র পাওয়া যায় না।

ধনপতির খুল্লনাকে বিবাহ করার কারণ দেখাতে গিয়ে মানিক দত্ত দেবীর কৌশলের সঙ্গে নিজস্ব গ্রাম্যস্থূল জীবন ভাবনার সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। দেবী চণ্ডী স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উজানী নগরের রাজা বিক্রমকেশরকে স্বপ্নাদেশে জানায় যে, রাজা যেন অপুত্রক ধনপতি সদাগরকে তার রাজদরবারে সম্মান না দেয়। স্বভাবতই রাজা বিক্রমকেশর ধনপতির প্রতি সেই আচরণ করে। এগার বছর বয়সে দাঁড়িয়ে লহনা এসময় ধনপতিকে আরও চার বছর অপেক্ষা করতে বলে পুত্র সন্তানের জন্য, কিন্তু তা না হলে ধনপতি যেন দ্বিতীয় বিবাহ করে। সেই প্রসঙ্গে লহনার পরিহাসচ্ছলে বলেছে।

''পরার বালক প্রভু উদরে ধরিয়া।

ছেইলা দশবার প্রভু দিব প্রসবিয়া।।''[২৮]

এধরনের উক্তি মধ্যযুগের কাব্যের ক্ষেত্রে তেমন আশ্চর্যজনক নয়। গায়েন কবি মানিক দত্ত শ্রোতাদের আনন্দ দানের জন্য অবলীলাক্রমে এরূপ বাক্য তুলে ধরতে দ্বিধা করেন নি।

স্ত্রীর প্রতি ক্ষুব্ধচিত্ততার কারণকে ধনপতির পায়রা উড়ানোর কার্য হিসাবে এই কাব্যে তুলে ধরা হয়েছে। পরিস্থিতি ও ঘটনার সঙ্গে ধনপতি চরিত্রের প্রতিক্রিয়া সামঞ্জস্যপূর্ণ ও অনিবার্য। ধনপতির সঙ্গে স্ত্রী লহনার এই বিষয়কে নিয়ে গ্রাম্য কটুক্তিযুক্ত কোন্দলকে কেন্দ্র করেই দুর্বলা দাসীর আগমন। কবি এই চরিত্রটি কাহিনীতে উপযুক্ত সময়ে প্রবেশ ঘটিয়েছেন। ধনপতির পায়রা খুল্লনার কাচুলিতে নর-নারীর মিলন চিত্র দেখে তা ক্ষতবিক্ষত করার মধ্যে আদিরসের আভাস রয়েছে। খুল্লনার সঙ্গে বিবাহ পাকা হওয়ার পর প্রতিবেশিনীদের পতিনিন্দা অংশটি মধ্যযুগের সমাজ প্রেক্ষাপটে বিশেষত্বের পরিচায়ক। যুবতী নারীরা ধনপতিকে দেখে তাদের বিফল দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে আক্ষেপের করুণ সুর ধ্বনিত করেছে। শুধু যুবতীরা নয়, বিধবা নারীদেরও বেদনাময় দীর্ঘ সঞ্চিত ও পূর্ব স্মৃতিকে কবি হাস্যরসিকতার ভেতর দিয়ে সরস করে তুলেছেন। বিধবানারীর জীবন ও সমাজের অসহায় অবস্থার কথা তাদের উক্তিতে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তারা স্বামী অন্তর্ধানের কঠিন জীবনকে অনুভব করে খুল্লনাকে বলে —

''প্রাণন্ত হৈলে উহাক কোথা না পঠাও।
বিকালে হুড়ুকা লাগায়ো বিহানে খসাও।।''[২৯]

এমনকি, এক আশি বছরের বৃদ্ধাও ধনপতিকে দেখতে আসার আগে তার মনে বিবাহের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়।

''সকল রাইহ থাকিতে বুড়িক পাইল রসে।
কাচা হরিদ্রা কটূ তৈল আপন গায়ে খোশে।।''[৩০]

শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধা নিজের অন্তর বাসনাকে দুই নাতিনীর মধ্য দিয়ে পেতে চেয়েছে। সমাজের বিভিন্ন ধরনের অবহেলিত ও লাঞ্ছিত নারী জীবনের লেখচিত্র কবি তুলে ধরেছেন। 'নারীগণের পতিনিন্দা' বিষয়টি সংযোগে কবির সমাজ সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও কাহিনী গ্রন্থনার দিক থেকে এই বিষয়টি প্লটের গতিবেগকে মন্থর করেছে সত্য, তবে সমাজ ও নারীর মনস্তত্ব ব্যাখ্যায় এর গুরুত্ব রয়েছে।

খুল্লনার বিবাহের অনুষ্ঠানের লোকাচারগুলি সমাজ ভাবনার বিষয় হিসাবে এসেছে। লক্ষণীয়, এয়োনারীদের সঙ্গে খুল্লনার মাতা রম্ভাবতীর 'জলসাধা'র গানটির সঙ্গে মালদহ জেলায় প্রচলিত বিবাহের গানের মিল রয়েছে। কবি যে নিজ অঞ্চলের আচার অনুষ্ঠানকে কাব্যে স্থান দিয়েছেন তা বোঝা যায়।

ধনপতির বিবাহের পরদিন তার রাজা বিক্রমকেশরের রাজদরবারে গায়ে হলুদ নিয়ে উপস্থিত হওয়া তার আভিজাত্যের প্রকাশ। রাজা তাকে 'আটকুড়া' অপবাদ দেয়, তার উপযুক্ত জবাব দিয়েছে সে দ্বিতীয় বিবাহ করে। বণিক শ্রেণীর আভিজাত্যের দাম্ভিকতা ধনপতির চরিত্রকে আলাদা মাত্রা এনে দিয়েছে। আর, রাজা বিক্রমকেশরও তাকে না জানিয়ে বিবাহ করার অপরাধে ধনপতিকে কারাদণ্ড দিয়েছে। উচ্চ শ্রেণীর বিবাহে সর্বোচ্চ শাসক রাজার অনুমতি নেওয়া তৎকালের নিয়ম ছিল। এধরনের ঘটনাটিও কবির নিজস্ব।

এরপর কবি চণ্ডীর ব্রত প্রচারের জন্য শারি-শুক পাখির উপকাহিনীকে মূল কাহিনীর মধ্যে সংযুক্ত করেছেন। এই উপকাহিনীর সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত করে কবি আরও দুটি উপকাহিনীর সংযোগ করেছেন। যেমন শ্রীবৎস ও উতু-পাতুর উপকাহিনী। এই উপকাহিনীগুলি চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনীর গতিমুখ নিয়ন্ত্রণের একটি চাবিকাঠি। কবি এই বিস্তৃত বর্ণনায় শিল্প-সংযম রক্ষা করতে পারেন নি। কিন্তু দীর্ঘ চণ্ডীর কাহিনী শোনার মাঝে কাহিনীর সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত একটু ভিন্ন ঘটনার সমাবেশ পাঠককে ভিন্ন স্বাদের আস্বাদন এনে দিয়েছে। তা চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ধারায় সকল কবিই ব্যবহার করেছেন। তবে মানিক দত্তের কাব্যে এই উপকাহিনীটি বিস্তারিত। চণ্ডী তার ব্রত প্রচারের জন্য ইন্দ্রের সভায় আসে। সেখানে পুষ্পদত্ত ও বিদ্যামন্ত নামে দুই গায়কের রামগুণ গান শুনে ইন্দ্র পত্নী শচী মোহিত হয়ে স্বামীর বুকে হাত দেয়। তা দেখে এই দুই গায়ক পরিহাস করলে তাদের শারি-শুক নামে পাখি হয়ে মর্ত্যে জন্মাবার অভিশাপ দেওয়া হয়। অর্থাৎ শারি-শুকের পূর্ব নাম এবং পাখি রূপে জন্ম গ্রহণের কারণ এই কাব্যে বিবৃত হয়েছে। প্রসঙ্গত, কবি সমকালীন রামভক্তিবাদকে এই স্থানে গুরুত্বের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। শুধু তাই নয়, কীভাবে উজানী নগরের রাজা বিক্রমকেশরের কাছে এই দুই পাখি পৌঁছোল তার বিভিন্ন সম্ভাব্য ও সম্পর্কযুক্ত ঘটনার দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। শারি-শুক প্রথমে রাজা শ্রীবৎসের কাছে পালিত হয়। সেখান থেকে শনির ছলনায় শ্রীবৎস ও তার স্ত্রী চিন্তাবতী তাদের বনে হারায়। উল্লেখযোগ্য, এধরনের ঘটনা ও চিন্তাবতীর নাম অন্য কোন চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে লক্ষ্য করা যায় না। সে যাইহোক, এরপর উতু-পাতু নামে দুই ব্যাধ তাদের শিকার করে। উতু-পাতু নামে দুই বিরল ব্যাধ চরিত্রের উল্লেখ করার সঙ্গে কবি নিম্নশ্রেণীর গ্রাম্য ব্যাধের অর্থনৈতিক জীবনের চিত্র তুলে ধরেছেন সুন্দর ভাবে।

অতঃপর, ধনপতির পক্ষিদ্বয়ের জন্য স্বর্ণপিঞ্জর আনার জন্য গৌড়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। সেই পরিবেশে লহনা কর্তৃক নীলাবতীর দ্বারা খুল্লনাকে অপদস্ত করার জন্য যে সকল তুক্তাকের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে তা তার বর্ণনার সূক্ষ্মতা সত্যিই আমাদের বিস্মিত করে। নীলাবতীর এই তুক্তাক করার বিষয়টিকে কবির কলমের আঁচড়ে সজীব হয়ে উঠেছে। লোকজীবনে বশীকরণের কৌশল বর্ণনায় কবি এখানে সিদ্ধহস্ত। কাহিনী গ্রন্থনায় চিঠির

উপাদান ব্যবহারেও তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। স্বামীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় খুল্লনা গৃহে দেবীর পূজার আয়োজন করেছে। তাতে দেবী প্রীত হয়ে খুল্লনার সামনে বর দিতে উপস্থিত হয়েছে। দেবী ও খুল্লনার এই সময়কার কথোপকথন লহনা শুনে সন্দেহ হয়। লহনার কথায় ধনপতি গৃহে ফিরে চণ্ডীর ঘট ভেঙ্গে ফেলে। শেষে যাত্রা শুরু করার মনস্থ করলে নানা অশুভ সংকেত দেখে ধনপতি ভীত হয়। ধনপতি দৈবজ্ঞকে ডেকে আনে — ''জোতিষ পুথিখান বিচারিএগ নৈল।''[৩১] দৈবজ্ঞের মুখে বিপদের কথা শুনে তাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করার নির্দেশ দিয়ে বাণিজ্য যাত্রা করে। তখন কবি খুল্লনা কর্তৃক যে দেবীর পূজার পরিচয় আছে তাতে তান্ত্রিক সাধনার প্রভাব রয়েছে বলে মনে হয়। খুল্লনা চণ্ডীর বীজ মন্ত্র জপ করে। তন্ত্র শাস্ত্রানুযায়ী খুল্লনা ঘটের উপর দেবীর পূজা করে। সেই দেবী ভয়ঙ্কর। এরূপ পূজা পদ্ধতি সম্বন্ধে চিন্তাহরণ চক্রবর্তী বলেছেন — ''ইহার কারণ বোধ হয় ইহাদের মূর্তির ভীষণতা।''[৩২] এই ভীষণ বা প্রচণ্ডা দেবীকে সন্তুষ্ট করতে হলে অহংকে বলি দিতে হয়।

কবি ধনপতির গৌড়ে যাত্রার পর লহনার পরিকল্পনায় অত্যন্ত সামাজিক সচেতনতায় পরিচয় দিয়েছেন। লহনাকে কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনা করতে দুর্বলা নামে যে একটি দাসী চরিত্রের নাম এসেছে বাস্তব রক্ত মাংসে গড়া। সে এই কাব্যে অত্যন্ত বিচক্ষণ। হৃদয়ে খুল্লনার করুণ অবস্থার জন্য সহানুভূতি থাকলেও তার মত দাসীকে যে, পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হয় তা কবির চরিত্র চিত্রণে দক্ষতা ফুটে উঠেছে। সে খুল্লনার দুঃখে মাতা রম্ভাবতীকে নারী হৃদয়ে সহানুভূতি থেকেই খবর দিয়েছে। সে ক্ষেত্রে লহনার সামনে তাকে কোন চতুরতার প্রকাশ করতে হয় নি। রম্ভাবতী চরিত্রটিও কন্যা খুল্লনার দুঃখে মানবিক হয়ে উঠেছে। সেই ক্রন্দন শুনে পুত্র হরিবাণ্যা গুরুগৃহ থেকে দৌড়ে আসাও চরিত্রটিকে প্রাণবন্ত ও সচল করে তোলা হয়েছে। কবির কথায় —

''হরি বান্যা গুরু স্থানে পড়িতে গিএগছিল।
মাএর ক্রন্দন শুনি ঘরে চলি আল্য।।''[৩৩]

মায়ের ক্রন্দনে সন্তানের ব্যাকুলতা প্রকাশে হরিবাণ্যা চরিত্রটি চমৎকার সৃষ্টি। খুল্লনা চণ্ডীর ব্রতদাসী। সে কারণে কাহিনীর অবশ্যম্ভাবী ধারায় ফুল্লনা ও ধনপতির মিলনের বার্তা হিসাবে প্রাকৃতিক জগতের যে মিলনের আভাস পাওয়া যায় তাতে কবি রোমান্টিক কল্পনা শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। তাই লহনাকে স্বপ্নে তার ভীষণ রূপ দেখায় তাতে খুল্লনাকে লহনা অতিযত্নে বন থেকে নিয়ে এসে বিভিন্ন প্রকার শাক-সবজী দ্বারা ভাত দেয়। সেখানে বিভিন্ন প্রকার শাক-সবজী এবং বাঙালীর গৃহে রন্ধনশালার একটি চিত্র আমাদের সামনে হাজির করেছেন। কবি খুল্লনা ও ধনপতির মিলনের জন্য চণ্ডী কর্তৃক একে অপরকে খুল্লনা ও ধনপতির ছদ্মবেশে স্বপ্নকে কাজে লাগিয়েছেন। দিনান্তে তাদের জৈবিক মিলনের পূর্বে অত্যন্ত কৌশলে কবি 'খুল্লনার বারমাস্যা'-কে এই কাব্যে তুলে

ধরেছেন। কবি সেই বারমাস্যা শুরু করেছেন কার্তিক মাস থেকে আর শেষ করেছেন আশ্বিন মাসে। হেমন্ত ঋতু দিয়ে সূচনা খুল্লনার এই বারমাস্যা নারী হৃদয়ের শূন্যতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ও কাব্যগুণ বিশিষ্ট।

ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত বণিকদের মধ্যে চাঁদ সদাগর চরিত্রটির উল্লেখ আমাদের আশ্চর্য করে। তাকেই নিমন্ত্রিত সভায় বণিকদের প্রধান করা হয়। তাতে বণিক মহলের কোন্দলে তাদের ঐতিহ্যের অন্তঃসারশূন্য চেহারা তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে খুল্লনার সতীত্বের পরীক্ষায় উদাহরণ স্বরূপ রামায়নের প্রসঙ্গ আনায়ন চিরাচরিত সংস্কারজাত। খুল্লনার জৌঘর পরীক্ষায় তাকে উদ্ধারের নিয়ে দুর্গার সঙ্গে শিবের কোন্দলের ঘটনাটি এই কাব্যে রয়েছে। সেই কোন্দলে দুই শক্তির বিরোধের বিষয়টি বড় হয়ে উঠেছে। পরে দুর্গা তার ভক্তকে রক্ষার জন্য ব্রহ্মার কাছে যায় এবং সে খুল্লনাকে জৌঘর থেকে রক্ষা করে।

''ব্রহ্ম মন্ত্র পড়ে ব্রহ্মা পরীক্ষার ঘরে।
অগ্নি শীতল হৈল ব্রহ্মা দেবের বরে।।''[৩৪]

এমনকি, জৌঘর পরীক্ষায় খুল্লনা মরলে ধনপতির জ্ঞাতিগণকে রাজা বিক্রমকেশর শাস্তি বিধান করবে তার ঘটনা মানিক দত্তের কাব্যে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

কবি ধনপতির দ্বিতীয়বার সিংহলে যাত্রার প্রেক্ষাপট নির্মাণ করেছেন রাজকোষ থেকে একটি জিনিস চুরির বিষয় দ্বারা। রাজভাণ্ডার থেকে নেপাল নামে এক চোর চন্দন চুরি করে। এই চুরির বিষয়টি ঘটেছে চণ্ডীর ছলনায়। রাজভাণ্ডারে বিষনাশক চন্দনের সঙ্গে শঙ্খ দ্রব্যের অভাব দেখা দেয়। স্বভাবতই এই কাব্যে ধনপতির সিংহলে বাণিজ্য যাত্রার ব্যাপারটি অনিবার্য হয়ে উঠে। স্বামীর সিংহলে যাত্রাকে নিয়ে লহনা ও খুল্লনার চরিত্রের যে পরিচয়টি ফুটে উঠে তা চরিত্র রচনায় স্বতন্ত্রতার পরিচায়ক। খুল্লনা সতীন-যন্ত্রণার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য স্বীয় স্বামীকে গৃহ ছাড়া করতে অনিচ্ছুক। তাই সে গৃহে মজুত চন্দন রাজাকে দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। আর লহনা তার এই মনোবাঞ্ছার বিপক্ষে। সে নিজগৃহ-সম্পদের হানির আশঙ্কায় কটাক্ষ করে বলে —

''প্রভু তথা গেলে পাইবা দুখ দেখহ কামিনীর মুখ
সর্বস্ব রাজার তরে দিঞা।
স্ত্রীর বচনে তুমি থাক ঘরেতে বসিঞা।।''[৩৫]

কবি এই ঘটনার মধ্য দিয়ে বণিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক অবস্থা ও সতীন যন্ত্রণার অনবদ্য দিকটি তুলে ধরেছেন।

এরপর কবি ধনপতি ও খুল্লনার সন্তান শ্রীমন্তের জন্ম ও তার শৈশব জীবনের ঘটনা বিবৃত করেছেন। কবি ধনপতির 'জয়পত্র'-এ উজানীর রাজা বিক্রমকেশর এবং ধনপতির বংশ

তালিকার যে পরিচয় দিয়েছেন তা অত্যন্ত তথ্য সাপেক্ষ। এমনকি ধনপতির জয়পত্রে পুত্র বা কন্যার নামের উল্লেখ এবং তার সন্তানের সিংহল যাত্রার অগ্রিম আভাস পাঠক চিত্তকে কৌতূহলী করে তুলেছে। যাত্রা পথের বর্ণনায় কবি মালদহের আঞ্চলিক পরিবেশের স্থাননামকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। খুল্লনার সাধভক্ষনেও যে সকল শাক-সবজির তালিকার উল্লেখ পাওয়া যায় তা সত্যিই পল্লীবাংলার মুখোমুখি করে দেয়। শুধু তাই নয়, কবি বণিক পরিবারের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে শ্রীমন্তের জন্মের রীতি-নীতি তুলে ধরেছেন। লক্ষণীয়, তিনি এই কাব্যে শ্রীমন্তের স্থানে কখন শ্রীপতি আবার কখন শ্রীমন্ত নামটি ব্যবহার করেছেন। তার শৈশবকাল পুরাণ প্রভাবিত নয়। গ্রাম্য বালকের স্বভাব বৈশিষ্ট্য তার চরিত্র অঙ্কনে রেখাপাত ঘটিয়েছেন। তা একান্তই লৌকিক ও বাস্তব সম্মত বলে মনে হয়। এছাড়া কবির ষাইট দত্তের ছেলে ভোলা নামটি নির্বাচনের সঙ্গে ঘটনা ও পরিস্থিতির সামঞ্জস্য রক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীমন্তের দৌরাত্ম লক্ষ্য করে মাতা খুল্লনা তাকে গুরু গৃহে শিক্ষা লাভের কথা ভাবে। তার শিক্ষকের নাম শ্রীহরি। সেখানে শ্রীমন্তের পাঠ্যবিষয় নির্বাচনেও কবির বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীমন্তকে শৈশবে সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ করতে হয়নি। সে 'ক', 'খ', 'বারফলা', 'পিঙ্গল', 'সুবন্ত' ও 'অভিধান' প্রভৃতির শিক্ষা লাভ করে। কবির ভাষায় —

''ক, খ পড়েন সাধু গুরুর মন্দিরে।
বার ফলা পড়ি সাধু শাস্ত্রপাট করে।।
পিঙ্গল পড়িল আর পড়িল সুবন্ত।
অভিধান পড়িয়া শব্দের পাল্য অন্ত।।''[৩৬]

এমনকি দুর্গাও গৃহে এসে শ্রীমন্তকে পড়ায়। এরূপ গৃহশিক্ষকের ব্যবস্থা অন্যান্য চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেখা যায় না। এখানে কবি দেবীর প্রভাবকে অতি প্রাধান্য দিয়েছেন।

শিক্ষাগুরুর সঙ্গে শ্রীমন্তের দ্বন্দ্বের ঘটনাটি কাহিনী গ্রন্থনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যময়। তবে এই দ্বন্দ্বের কারণ আকর্ষণীয়। দেবীর অলৌকিক ছলনায় শ্রীমন্তের হাতের খড়ি মাটিতে পড়ে যায় তা পণ্ডিতকে তুলতে বললে সেই ধৃষ্টতাজনিত কারণে শ্রীমন্তকে 'জারজ' বলে। এই দ্বন্দ্ব সৃষ্টির জন্য কবি যে কৌশলটি বেছে নিয়েছেন, তা কাহিনী গ্রন্থনার ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মত।

কবি শ্রীমন্তের যাত্রাকালে যে সপ্তডিঙ্গার নাম উল্লেখ করেছেন সচরাচর লক্ষ্য করা যায় না। এই সপ্তডিঙ্গার নাম হল 'কর্ণ', 'উদরতারা', 'চন্দ্রখোলা', 'শাশিয়া', 'ধুমকুরা', 'যাত্রাসিদ্', 'হরিহরা' প্রভৃতি। দেবী শ্বেত মাছির ছদ্মবেশে খুল্লনাকে সিংহল যাত্রার পরবর্তী ঘটনা বলেছে। তার ফলে পাঠকের কৌতূহল এখানে বিঘ্নিত হয়েছে। শ্রীমন্তের তিন দিন নদীয়ায় অপেক্ষা করার ঘটনাও এই কাব্যের বিশেষত্ব। শ্রীমন্ত দ্বারা তার পূজা করানোর জন্য কাব্যে চণ্ডী ইন্দ্রের সভা

থেকে বিচিত্র প্রকার মেঘ আনে। তাতে প্রতিকূল অবস্থায় পড়ে শ্রীমন্ত দেবী 'চৌতিশা' উচ্চারণ করার পরেও মগরার জলের উত্তাল আবহাওয়া কাটে না। তখন শ্রীমন্ত অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে তুলসীর মালা পরিধান করে এবং বিষ্ণুনাম উচ্চারণ করে প্রথম সূর্য পূজা করে নেয়।

''তুলসীর মাল্য সাধু গলায় পহ্রিল।
শ্রীবিষ্ণু বলিঞা জল মুখে তুল্যা দিল।।
*　　*　　*
দেবকর্ম্ম পিতৃকর্ম্ম করে মন দুঃখে।
সূর্য্যের নামতে অর্ঘ্য ধরে পূর্ব্বমুখে।।''[৩৭]

শ্রীমন্তের এই আচরণে কবি বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে তান্ত্রিক ধর্মের পূজা পদ্ধতির মিলন ক্ষেত্রকে তুলে ধরেছেন। তান্ত্রিক মতে প্রথম সূর্যপূজার কথা উল্লেখ রয়েছে। সেই কথা দ্বিজমাধব বিরচিত 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' গ্রন্থের সম্পাদক সুধীভূষণ ভট্টাচার্য বলেছেন — ''মঙ্গলচণ্ডী পূজার প্রথমে সূর্য্য-পূজা করা তান্ত্রিক মতে প্রশস্ত।''[৩৮] অতঃপর সে চণ্ডীর পাশাপাশি পিতা, মাতা, বিমাতা, দাস-দাসীকে স্মরণ করেছে। শ্রীমন্তকে তখন দেবী চণ্ডী কোলে তুলে নেয়। তার উগ্রমূর্তির সঙ্গে শান্ত স্নিগ্ধ মাতৃবাৎসল্যের রূপ দেবী মঙ্গলাচণ্ডীকে মনে করিয়ে দেয়। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এরূপ সূর্য্যের তর্পণ ও স্বীয় আত্মীয় স্বজনদের তর্পণ করার বিনয় চৌতিশার পর বিবৃত হয়েছে।

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কমলে কামিনীর কাছে বিভিন্ন জীব-জন্তুর মধ্যে হিংস্রতা প্রকাশ পায় না। দেবীর মোহিনীরূপে শ্রীমন্ত ভয় পায়। কর্ণধার বুদ্ধিমন্তের কথায় শ্রীমন্ত কালিদহের দিকে এগিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে কবি চরিত্রকে কাব্যে গুরুত্ব প্রদান করেছেন। রত্নমালার ঘাটে তাদের আগমন বার্তা দক্ষিণ পাটনের কাছে শত্রু আশঙ্কায় পরিণত হয়েছে। তাই কোটালের বিপরীত বাদ্যের আওয়াজ শুনে সকলে শঙ্কিত হওয়ার মধ্য দিয়ে কবি সমকালীন বিভিন্ন রাষ্ট্র শক্তির আক্রমনের আভাস দিয়েছেন। কিন্তু শ্রীমন্তকে তাদের শত্রু পক্ষ বলে মনে হয়নি। শ্রীমন্তের রূপ দেখে পুরনারীগণ তাদের স্বামীর প্রতি আক্ষেপের দিকটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। শ্রীমন্ত রাজা শালবানকে ভেট করতে গেলে যেসকল খাদ্যদ্রব্য নেয় তার মধ্যে কবি বারমাসে আম ও তালের উল্লেখ মালদহ তথা উত্তরবঙ্গের কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

''বারমাস্যা আম্র দিল রামমাস্যা তাল।
বারমাস্যা দিলেন জামির করনাল।।''[৩৯]

স্বাভাবিক ভাবেই শ্রীমন্তের সঙ্গে রাজার বাণিজ্য দ্রব্যের আদান প্রদান সমাপ্ত হয়। তারপরই এই কাব্যে চণ্ডী কর্তৃক পূর্বোল্লেখিত পিতার সঙ্গে পুত্রের সাক্ষাৎ এবং সুশীলার সঙ্গে শ্রীমন্তের বিবাহের

কথা আসে। তখন চণ্ডীর অলৌকিক স্বপ্নের দ্বারা রাজা শালবানের মধ্যে শ্রীমন্তের প্রতি সন্দেহ তৈরী করা, তাতে শ্রীমন্তকে বন্দী করা এবং বন্দী শ্রীমন্ত রাজাকে কমলে কামিনীর ঘটনা উত্থাপন করা ইত্যাদি একে একে কাব্যে স্থান লাভ করেছে। কাহিনী গ্রন্থনায় কমলে-কামিনী চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অপরিহার্য অংশ। কবি এই ঘটনায় কাহিনীকে সচল করতে কাহিনী গ্রন্থনায় কৌশল হিসাবে অলৌকিক স্বপ্নের আশ্রয় নিয়েছেন। সেক্ষেত্রে চরিত্রের ব্যক্তিত্ব প্রকাশের ক্ষেত্রে বাধা প্রাপ্ত হয়েছে বলে মনে হয়।

শ্রীমন্তের বিবৃত কমলে কামিনীর ঘটনা রাজা শালবানের কাছে মিথ্যা প্রমাণিত হয় এবং তাকে মশানে বলীর আগে শ্রীমন্তের ক্রিয়াকর্মের মধ্যে তন্ত্রাচারের আভাস রয়েছে। সে প্রথমে গঙ্গার জলে নিজেকে পবিত্র করে সূর্য পূজা করে। তারপর একে একে আত্মীয় স্বজনদেরকে তর্পণ করে। শ্রীমন্ত চণ্ডীর উদ্দেশ্যে চৌতিশা উচ্চারণে উগ্র বা প্রচণ্ডা শক্তি দেবীকে স্মরণ করে দেয়। প্রসঙ্গত, মানিক দত্তের কাব্যে মোট তিনটি চৌতিশার উল্লেখ রয়েছে। সেই দেবী হল এখানে শক্তিরূপিনী কালী। শালবান কর্তৃক শ্রীমন্তকে মশানে বলি দেওয়ার সময় তার দেবীর উদ্দেশ্যে চৌতিশা বিবৃতি মানিক দত্তের কাব্যে পাওয়া যায়। এই চৌতিশা অংশটি তন্ত্রাচারের দ্বারা প্রভাবিত। সেই সঙ্গে শৈবশাক্ত এবং শাক্ত বৈষ্ণবের মিলন মহিমাও ধ্বনিত হয়েছে। চৌতিশার দ্বারা শ্রীমন্ত বিপদে দেবীকে স্মরণ করে। চণ্ডী আভাস পায় বিভিন্ন অশুভ লোক বিশ্বাসের ইঙ্গিতের দ্বারা। কাব্যিক গুণ না থাকলেও সমকালীন পাঠক নিজের সংস্কার-বিশ্বাস ও সমাজকে এই কাব্যে খুঁজে পাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাতে কবি চণ্ডীকে সাধারণ মানবীতে পরিণত করেছেন। এই সকল স্থানে পাঠক যেন দেবীর সঙ্গে একাত্মবোধ করে। এই অশুভ সংকেতের পর চণ্ডী পদ্মাকে দিয়ে গণনা করিয়ে প্রকৃত ঘটনা জানতে পারে।

‘‘রাম ঘড়ি গনি পদ্মা বলিছে দুর্গাকে।
মশানে শ্রীমন্ত সাধু স্মরিছে তোমাকে।।’’[৪০]

নিজের ভক্তকে উদ্ধারের জন্য চণ্ডীর রণ সজ্জা কালীর মত। এই শক্তিরূপিণী দেবীর যুদ্ধে যাত্রার সময় ‘রাম’ নাম স্মরণ করে বের হওয়ার মধ্যে সমকালীন সমাজে রামভক্তির ছায়াপাত রয়েছে। মানিক দত্ত সমাজের এই সমস্ত দিকগুলি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

দেবীর মশানে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর ছদ্মবেশে উপস্থিত হওয়া এবং দেবী চণ্ডী তাদের সম্মুখে বেদ পাঠ করে, প্রতিদানে শ্রীমন্তকে শালবানের কোতালদের কাছ থেকে চায়।

‘‘বুড়ি রূপে দুর্গামাতা মশানতে গেল।
বেদ পড়ি কোতালকে আশীর্ব্বাদ দিল।।’’[৪১]

কিন্তু তারা নারাজ হলে দেবী চণ্ডী তাদেরকে একাদশীর ব্রত পারণার জন্য খাদ্য বস্তু হিসাবে

একলক্ষ ছাগল, ভেড়া এবং মহিষ চায়। তার ফলে কোতালরা তাকে ডাইনী অপবাদ দিলে তার ভয়ঙ্কর ও উগ্রমূর্তি প্রকাশ পায়। শুরু হয় কোতালদের সঙ্গে দেবীর যুদ্ধ। দেবী চামুণ্ডারূপ ধারণ করার পর দানাগণকে, বলবীর হনুমান এবং জমের পুত্র মঙ্গলাকে স্মরণ করে। যমের পুত্র মঙ্গলার কথা বলতে গিয়ে কবি মূল কাহিনীর বহির্ভূত তার শক্তি সম্বন্ধে কিছু অতিকথন করেছেন। যা তাঁর কাব্যের কাহিনীকে ভারাক্রান্ত করেছে। এছাড়াও কাহিনীতে তিনি নতুন নতুন চরিত্রের সংযোজন করেছেন। ঘটনার সঙ্গে চরিত্রের এরূপ সমাবেশে কাহিনীর মধ্যে জটিলতা বৃদ্ধি হয়েছে।

যুদ্ধে শালবান রাজার সমস্ত সৈন্যের মৃত্যু হয়। তাতে বাধ্য হয়ে সে দেবীর স্তব করেছে। তার আগে দেবীর পরিচয় জানতে চাইলে দেবী অত্যন্ত অভিনব ভাবে আত্মপরিচয় প্রদান করে। কাহিনী গ্রন্থনায় দেবী চণ্ডীর শালবান রাজার কাছে পরিচয় প্রদান স্বতন্ত্র সংযোজন বলা যেতে পারে। সেখানে একই সঙ্গে দেবী তার লৌকিক ও পৌরাণিক পরিচয় দিয়েছে। লৌকিক পরিচয়ের সঙ্গে মিশে আছে মালদহের আঞ্চলিক পরিচয়েরর সংযোগ সূত্রটি। এইভাবে পরিচয় পত্র দ্বারা মশানের পালা সমাপ্ত হয়েছে, যা অন্যত্র পাওয়া দুষ্কর।

এরপর দেবী কর্তৃক কমলে কামিনী রূপ প্রদর্শন এবং পূর্ব শর্তানুযায়ী শ্রীমন্তের বিবাহ প্রসঙ্গটি সামনে আসে। মানিক দত্ত সেক্ষেত্রে দুটি কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার সংযোজন ঘটিয়েছেন। সেই দুটি ঘটনা কাহিনীকে গতিশীল করেছে। আর অপর ঘটনাটি এর সঙ্গে কার্যকারণ সম্পর্কযুক্ত। এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে অলৌকিকতাকে। তাই দেবীর ভক্ত শ্রীমন্তের অনুরোধে চণ্ডী হনুমানকে যমালয় থেকে মৃতদের প্রাণ ফিরিয় আনতে পাঠায়।

‘‘দুগার কথা শুনি বীর করিল গমন।
একদণ্ডে জমপুরে দিল দরশন।।’’[৪২]

হনুমান সমস্ত সৈন্যদের প্রাণ ফিরিয়ে আনলে দেবী চণ্ডী পবিত্র গঙ্গাজল হাতে নিয়ে ব্রহ্মমন্ত্র উচ্চারণ করলে তারা প্রাণ ফিরে পায়। এতে কবি জীব সৃষ্টির মূল উৎস ও গঙ্গার পবিত্র জলের পুরাণ নির্ভর সত্যকে তুলে ধরেছেন। তবে নীলারানীর চরিত্রের উল্লেখ, কিংবা তার বুদ্ধিমত্তায় পুনরায় প্রাণ ফিরে পাওয়ার ঘটনা অন্য কবিদের কাব্যে নেই। এমনকি, পুরাণে বর্ণিত বিশল্যকরণী দ্বারা প্রাণ ফিরে পাওয়ার ঘটনাটি এখানে কাজে লাগানো হয়নি। বরং এই কাব্যে সাধারণ মানুষের বিশ্বাসকে অর্থাৎ মৃত্যুর পর প্রাণ যমালয়ে চলে যায় এই বিশ্বাসকে কাজে লাগানো হয়েছে। কবি সেই লৌকিক বিশ্বাসকে তুলে ধরেছেন।

শ্রীমন্তের বিবাহ বর্ণনায় কবি বাঙালী গৃহের চিত্র এঁকেছেন। সর্বত্রই এই বিবাহের কথা রয়েছে। তবে জলসাধা, ব্রাহ্মণ দিয়ে পুথি পড়ে ধান দুর্বা দিয়ে পিতা মাতার বরকে বরণ করা, বরকন্যার সপ্তবার প্রদক্ষিণ, মালাবদল, আত্মীয় স্বজনদের দান সামগ্রী প্রদান ইত্যাদি সমস্ত বিষয়গুলি

বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এই দানসামগ্রী প্রদানের সময়ে শ্রীমন্তের দানস্বরূপ বন্দীঘর চাওয়ার মধ্যে কোন কারণ স্পষ্ট করে বলা হয়নি। শ্রীমন্ত নিজের বেদনাকে অন্তরে গোপন করে রেখেছে। দেবীর স্বপ্নে তার গৃহমুখী ভাবনার জাগরণ ঘটে। সেই প্রসঙ্গে সুশীলার বারমাস্যা বর্ণিত হয়েছে। এই কাব্যে আশ্বিন মাসে ব্রাহ্মণ দিয়ে দুর্গা পূজা করা এবং অগ্রহায়ণ মাসে নবান্ন উৎসব পালন করার এক অনবদ্য চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

অতঃপর শ্রীমন্তের নিজ দেশে যাত্রার পথে পিতা ধনপতির সপ্তডিঙ্গাসহ কাণ্ডারীদের মৃত্যুতে আক্ষেপ ও সেই সঙ্গে দেবীর অপার মহিমাকে বড় করে দেখানো হয়েছে। তখন পুত্রবধূ সুশীলার চণ্ডীপূজা ঘটনাটি এই কাব্যে পৃথক সংযোজন হয়েছে। সেই পূজায় রয়েছে তন্ত্রশাস্ত্রের প্রভাব। রজোগুণের অধিকারী জবা ফুল দিয়ে আদ্যের মন্ত্র পাঠ করে দেবীর পূজায় তার সাক্ষ্য মেলে। দেবীর কৃপায় সমস্তই ধনসম্পদ নিয়ে নদীর কূলে ফিরলে সেখানেই খুল্লনা সহ এয়োগণ তাদের বরণ করতে আসে। শ্রীমন্ত মাতা খুল্লনার মনের অবস্থা পরীক্ষার জন্য পিতার একটি বস্ত্রখণ্ড তার সামনে ফেলে। তার মধ্য দিয়ে যেমন কবির সামন্ততান্ত্রিরক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর প্রতি পুরুষের সন্দেহ প্রবণতা এবং তা দেখাতে গিয়ে শ্রীমন্তের দ্বারা যে কৌশল অবলম্বন করেছেন তা সত্যিই উপভোগ্য। বিক্রমকেশরের কন্যা জয়াবতীর সঙ্গে শ্রীমন্তের দাম্পত্য জীবনের কথা না থাকলেও তার দ্বারা চণ্ডী-পূজাকে কাব্যে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এইভাবে বিভিন্ন রাজ্যের চার নারীর দ্বারা দেবী চণ্ডীর পূজা প্রচার করাই মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মূল অভিসন্ধি বলে মনে হয়। কবি নিজেই বলেছেন —

''চার রাজ্যের চারিজন একত্র হইল।
দুর্গাকে পূজিতে সঙে একচিত্ত কৈল।।''[৪৩]

এমনকি এই কাব্যে ধনপতি পুত্রের দ্বিতীয় বিবাহ দেওয়ার পরেও নিজের ইচ্ছায় চণ্ডীর পূজা করতে চায়নি। পুত্র শ্রীমন্ত ও দেবী চণ্ডীর অনুরোধে শেষ পর্যন্ত ধনপতি তার পূজো করে। যখন দেবী চারজন ভক্তকে নিয়ে স্বর্গে যাচ্ছিল তখন তার সঙ্গে যমের বিবাদ এবং পরে বিষ্ণু ও শিবের মাধ্যমে সে বিবাদ ভঞ্জন এবং দেবীর তাদেরকে নিয়ে স্বর্গে গমনের ঘটনা রয়েছে। তবে এখানে বিবাদ ও বিবাদ ভঞ্জন কবির নিজস্ব সৃষ্টি।

শেষে মানিক দত্ত সমগ্র কাব্যের একটি সংক্ষিপ্ত ব্রতকথা বিধৃত করেছেন। তাঁর পরবর্তী চণ্ডীমঙ্গলে কবিরা এই ব্রতকথা সংক্ষিপ্তাকারে তাঁদের কাব্যে সংযুক্ত করেন নি। সেখানে চণ্ডীর পূজার বার, ক্ষণ, উপযোগিতার কথাই প্রাধান্য পেয়েছে। কবি বলেছেন —

''পূজার নিয়ম কথা শুন সর্ব্বজন।
করিহ দুর্গার পূজা হবে পুত্রধন।।''[৪৪]

এভাবে এই কাব্যে কাহিনী গ্রন্থনায় ব্রতকথা ও লৌকিক উপাদানকে লোকমানসের প্রত্যয়ের সঙ্গে মিশ্রণ করে প্রকাশ পেয়েছে। মঙ্গলকাব্যের এই ব্রতকথার রূপটি প্রাচীনতর। মানিক দত্তের কাব্যে সেই প্রাচীন রূপটি বিদ্যামান। সেই দিক থেকে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারায় তিনি প্রথম কবি।

তাঁর চণ্ডীমঙ্গলের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডতা। ব্যাধ খণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ধনপতি খণ্ডের ব্রতকথা বর্ণনা এবং শ্রীমন্তকে সিংহল যাত্রায় অভয়দান হিসাবে দেবী চণ্ডী কর্তৃক কালকেতুর উৎকর্ষময় জীবনকে উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরা হয় ধনপতি খণ্ডে। তাঁর কাব্যে যখন সাধারণ মানুষ তথা ভক্ত সাধারণকে দেবীর অনুগামী করতে চেয়েছেন তখন দেবীর শক্তিরূপিনী রূপটিই সর্বদা প্রাধান্য পেয়েছে। সেই শক্তি দেবীর কথাই মানিক দত্তের কাব্যে বারবার উঠে এসেছে। তার প্রকাণ্ডরূপে ভক্ত মূর্চ্ছিত হলে সেই মুহূর্তে তার স্নেহময়ী কোমল মাতৃরূপ পরিস্ফুট হয়েছে। এই কাব্যে দেবীর দু'টি স্বভাবই তন্ত্রের দেবী ভাবনার অবলম্বনে সঞ্চারিত। দেবীর এই স্বরূপ কাব্যে ভক্তজনের বিপদ-আপদের মত বিশেষ বিশেষ মুহূর্তেভাস্বর হয়ে উঠেছে। তবে লক্ষণীয়, এই কাব্যের চণ্ডী স্বরূপে শক্তিরূপিনী, কিন্তু অন্তরে সে সমকালীন সাধারণ মানুষের মত লোকসংস্কারে গড়া রক্ত-মাংসের মানবী।

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ঘটনার চালিকা শক্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমাজ, নীতিকথা, অলৌকিক শক্তি, ভক্তিবাদ ও ধর্ম। এই কাব্যে স্বপ্নাদেশের বারংবার উল্লেখ, ভক্তের বিপদে তার কল্যাণ-হস্ত-প্রসারণ, ভক্তের সঙ্গে তার মানবিক আচরণ সার্বভৌম ও সহজ প্রত্যয়ের নিদর্শন। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য ধারায় মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যটি সেই বিশ্বাসের দৃঢ় ভিত্তি ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই জন্য কবি দেবতা ও মানবের মিলনের জন্য বহু উপলক্ষ্যকে কাব্যে সংযোজন করেছেন। তাতে সমকালের মানুষের প্রত্যক্ষ বিশ্বাসকে অর্জন করেছে। তা না হলে এমন নির্দ্বিধায় ও কোন প্রমাণ ছাড়াই কবি এরূপ কাহিনীর বয়ন করতে সাহস করতেন না। কাব্যটি সেই দিক থেকে সমকালের চাহিদার অনুকূলে রচিত।

ঘটনার আখ্যান যদি পাঠক বা শ্রোতার উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ বার্তা হয়, তাহলে মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল তাই। তিনি রামায়নকে সমকালীন মানুষের জীবন চলার ব্রতরূপে উপস্থাপন করেছেন। কাব্যের প্রত্যেকটি চরিত্র যেন সেই ব্রতের দাস। এই কাব্যের কাহিনী যখন কোন নতুন ঘটনায় প্রবেশ করেছে তখনই কবি তার কার্যকারণ সূত্র লঘু করে ফেলেছেন। সেখানে তাঁর উপস্থাপন ভঙ্গি গল্প বলার মত। এ প্রসঙ্গে কাহিনীতে ফুল্লরা ও লহনার অনুপ্রবেশ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের রীতি অনুযায়ী অভিশাপ, বারমাস্যা, চৌতিশা, নারীগণের পতিনিন্দা, বিবাহাচার ইত্যাদি এই কাব্যে সুন্দর ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তাঁর কাব্যে বহুস্থানে রয়েছে বাস্তবতার প্রকাশ। সহজ-সরল ভাষা বিষয়কে করেছে সাবলীল। এমনকি বিষয় নির্বাচনেও তাঁর মৌলিকতা অপর

একটি কাব্যগুণ।

মানিক দত্তের কাব্যটিতে বাস্তব রসের উদ্‌ঘাটন না হলেও তা বাস্তব সত্যযুক্ত তথ্যমূলক কাব্য বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না। তাঁর কাব্যের বাস্তব তথ্যগুলি গ্রাম্য পরিবেশের আত্মপ্রকাশ। রম্ভাবতীর দ্বারা মালিনীর তুক্‌তাক এই বিষয়ের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। কবি এখানে বাস্তব তথ্যের অবতারণা যেখানে করেছেন সেখানে কাহিনী গ্রন্থনার স্বচ্ছন্দ গতি ও সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রসারের দিকটি লক্ষ্য রাখতে পারেন নি। তাঁর বস্তু বর্ণনা কাহিনী গ্রন্থনাকে আড়ষ্ঠতা দান করেছে। মোটের উপর একথা বলা যেতে পারে যে, মানিক দত্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমাজে প্রচলিত বাস্তব সত্যের পরিচয় উদ্‌ঘাটন করেছেন। কিন্তু সেগুলিকে আত্ম প্রসারণের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী করতে পারেন নি। তার ফলে তাঁর কাব্যের গ্রন্থনা রীতি হয়ে পড়েছে শিথিল। এরূপ শিথিলতার কারণ হিসাবে বলা যায় — প্রথমত, মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল প্রচারমূলক। দেবীর আত্ম প্রতিষ্ঠার জন্য কারণে-অকারণে মাহাত্ম্যগীত হয়েছে। যেমন, কলিঙ্গরাজ সুরথ ও সিংহলরাজ শালবানের কাছে বিশ্বস্ত হওয়ার জন্য তার অলৌকিক মহিমা প্রকাশের প্রয়োজন ছিল। তারফলে কবি কাহিনী গ্রন্থনায় বেশি মনযোগ দিতে পারেন নি। দ্বিতীয়ত, কবির সামনে কোন চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাঠামো ছিল না। তাই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আদি স্রষ্ঠা হিসাবে এরূপ গ্রন্থনা হতে পারে। তৃতীয়ত, কবির শিক্ষা ও পাণ্ডিত্যের অভাবে হয়তো শিল্পের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে পারে। চতুর্থত, মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গ ল কাব্য রাজনৈতিক পরাভব একদিকে অসাধ্য সাধনক্ষম দেবতার আশ্রয় গ্রহণে ও অনুগ্রহ ভিক্ষায় প্রণোদিত করেছিল, তেমনি অপর দিকে দৃঢ়তর সমাজ ও ধর্ম সংহতির প্রতিও প্রেরণা সঞ্চার করেছিল। দেবীর অসীম শক্তির প্রকাশ ও লৌকিক ধর্মের বিষয়গুলি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এধরনের গ্রন্থনা রীতি পাঠকের কাছে কৌতুহল জাগ্রত করে। তার আবেদন আবেগ প্রবণ হৃদয়ের কাছে, বুদ্ধির কাছে নয়। তথ্যকে শিল্পরূপ দিতে না পারলেও তিনি যে একজন সমাজ সচেতন কবি ছিলেন, এই বিষয়ে সন্দেহ নেই।

তথ্যসূত্র :

১। হরিদাস পালিত; গৌড়ীয় মঙ্গলচণ্ডী গীতে বৌদ্ধভাব, সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, সম্পাদক নগেন্দ্রনাথবসু, ১৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩১৭, পৃ. ২৫০।

২। তদেব; পৃ. ২৫৩।

৩। সুনীলকুমার ওঝা; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৬৪-৬৫।

৪। রজনীকান্ত চক্রবর্তী; মানিক দত্তের মঙ্গলচণ্ডী, সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু, একাদশ

ভাগ, প্রথম সংখ্যা, ১৩১১, পৃ. ৩৫।

৫। সুনীলকুমার ওঝা; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২৮-২৯।

৬। তদেব; পৃ. ৩৫।

৭। সুধীভূষণ ভট্টাচার্য; ভূমিকা, দ্বিজমাধব রচিত মঙ্গলচণ্ডীর গীত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬৫, পৃ. ।

৮। সুনীলকুমার ওঝা; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৬৮।

৯। তদেব; পৃ. ৯৬।

১০। তদেব; পৃ. ১০৭।

১১। নীহাররঞ্জন রায়; বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), দে'জ পাবলিশিং, ষষ্ঠ সংস্করণ, মাঘ, ১৪১৪, পৃ. ৭১৩।

১২। সুনীলকুমার ওঝা; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১১২।

১৩। তদেব; পৃ. ১১৫।

১৪। নীহাররঞ্জন রায়; বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), দে'জ পাবলিশিং, ষষ্ঠ সংস্করণ, মাঘ, ১৪১৪, পৃ. ৪৮১।

১৫। সুনীলকুমার ওঝা; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১২২।

১৬। তদেব; পৃ. ১২৬।

১৭। তদেব; পৃ. ১৩০।

১৮। সুকুমার সেন; বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (? — ষোড়শ শতাব্দী) আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, জানুয়ারি, ১৯৯১, অষ্টম মুদ্রণ, নভেম্বর, ২০০৭, পৃ. ৪৫৪।

১৯। সুনীলকুমার ওঝা; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১৩০।

২০। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড : চৈতন্যযুগ (খ্রীষ্টীয় ১৪৯৩-১৬০৫ অব্দ), মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০০৬-০৭, পুনর্মুদ্রণ, ২০১০-২০১১, পৃ. ৯২।

২১। সুধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত; ভূমিকা, দ্বিজ মাধব রচিত মঙ্গলচণ্ডীর গীত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬৫, পৃ. ।

২২। সুনীলকুমার ওঝা, মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ১৫০।

২৩। তদেব; পৃ. ১৫৩।

২৪। তদেব; পৃ. ১৭০।

২৫। তদেব; পৃ. ১৭১।

২৬। তদেব; পৃ. ১৭৭।

২৭। তদেব; পৃ. ১৭৮।

২৮। তদেব; পৃ. ১৯৩।

২৯। তদেব; পৃ. ২০১।

৩০। তদেব; পৃ. ২০২।

৩১। তদেব; পৃ. ২৬৩।

৩২। চিন্তাহরণ চক্রবর্তী; তন্ত্রকথা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬২, পৃ. ৫৩।

৩৩। সুনীলকুমার ওঝা; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২২৮।

৩৪। তদেব; পৃ. ২৫৫।

৩৫। তদেব; পৃ. ২৬০।

৩৬। তদেব; পৃ. ২৮৬-২৮৭।

৩৭। তদেব; পৃ. ৩০৮।

৩৮। সুধীভূষণ ভট্টাচার্য; ভূমিকা, দ্বিজমাধব বিরচিত মঙ্গলচণ্ডীর গীত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬৫, পৃ. ।

৩৯। সুনীলকুমার ওঝা; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ৩১৬।

৪০। তদেব; পৃ. ৩৩৩।

৪১। তদেব; পৃ. ৩৩৫।

৪২। তদেব; পৃ. ৩৫৪।

৪৩। তদেব; পৃ. ৩৬৭।

৪৪। তদেব; পৃ. ৩৭৬।

——oo——